অস্তাচলের পথে

• সব্যসাচী •

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা ৯

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
পৌষ—১৩৫১

দাম—এক টাকা]

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

...তারপর টর্চ্চের আলো ফেলে একবার দেখে নিল...

পৃষ্ঠা—৬

অস্তাচলের পথে

এক
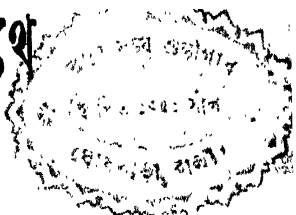
বেলা প্রায় ১২টা। আদালতের বিচার-কক্ষ কৌতূহলী-জন-সমাগমে পরিপূর্ণ। প্রৌঢ় বিচারক গম্ভীরমুখে তাঁর নিজ আসনে সমাসীন। তাঁর ডানদিকে কতকগুলি চেয়ারে নির্ব্বাচিত জুরীর দল উপবিষ্ট। কৌতূহলী-জনতার দৃষ্টি কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এক সুদর্শন যুবকের দিকে নিবদ্ধ। তার অদৃষ্ট-লিপি জানবার জন্যে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী তাঁর অকাট্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কারণ দেখানোর পর, আসামীপক্ষে নিযুক্ত আইনজ্ঞের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে নিজ আসনে উপবেশন করলেন।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলীর বক্তব্য শেষ হবার পর বিচারক নির্ব্বাচিত জুরীদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "মাননীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি জুরীবৃন্দ! এতদিন পর্য্যন্ত আপনারা আসামীর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সমস্ত যুক্তি-তর্কই অতি-

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে এসেছেন। আপনারা এখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করে, আসামীর অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করুন।”

জুরীরা বিচার-কক্ষ থেকে একে-একে অন্য কক্ষে প্রস্থান করলেন। বিচার-কক্ষে পূর্ণ নিস্তব্ধতা। কোথাও সামান্য একটা শব্দ পর্য্যন্ত নেই। আসামী বিষণ্ণমুখে প্রহরী-বেষ্টিত কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। মূর্ত্তিমান নিরাশা ও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কের ছাপ্ তার চোখে-মুখে পরিস্ফুট। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অদৃষ্ট-লিপি ঘোষিত হবে। উপবিষ্ট জনতা স্তব্ধভাবে অপেক্ষা করছিল। সকলের মন একটা সন্দেহ-দোলায় দুললেও আসামীর ভাগ্যফল সম্বন্ধে কি ঘোষিত হবে তা জানতে কারো বাকি ছিল না।

ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রবীণ পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ চ্যাটার্জ্জি বললেন, “তুমি যাই বল না কেন রিচার্ড, আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। স্বীকার করি তুমি আসামীর বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ হস্তগত করেছ যার দ্বারা সে-ই যে অপরাধী, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তুমি এই মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, আসামীর এ-যাত্রা অব্যাহতির কোনো আশাই নেই। হ্যাঁ, একমাত্র দৈব ছাড়া তার উদ্ধার লাভ অসম্ভব। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে যে, এই মামলায় কোনো গুরুতর গলদ বর্ত্তমান। পুলিশে আমি

একাদিক্রমে অনেক বছর চাকরি করেছি এবং বহু মারাত্মক অপরাধীও আমার সাহায্যে ধরা পড়ে উপযুক্ত শাস্তিলাভ করেছে। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে যে, কাঠ-গড়ায় দাঁড়ানো ঐজাতীয় লোক আর যাই করুক না কেন, কাউকে হত্যা করবার মত সাহস তাদের নেই।"

ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ড এই মামলার প্রধান সাক্ষী হিসেবে বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন, এবং পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ চ্যাটার্জ্জি এখানে উপস্থিত ছিলেন এই অদ্ভুত মামলার ফলাফল জানবার জন্যে।

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনে মিঃ রিচার্ড মৃদু হেসে বললেন, "আসামীর চেহারা সুদর্শন এবং বাইরে থেকে তাকে অত্যন্ত শান্ত নম্র বলে বোধ হয়, একথা আমিও স্বীকার করব মিঃ চ্যাটার্জ্জি! কিন্তু অতি শান্ত-শিষ্ট চেহারার অন্তরালেও যে অনেক সময়ে ভয়াবহ প্রকৃতির শয়তান বাস করে, একথা আশা করি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তুমি নিজেও হয়ত অনেক পেয়েছ। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রেও আসামীর কেবল বাহ্যিক-চেহারা দেখেই তার অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করলে অত্যন্ত ভুল হবে। আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো যেন ভুলে যেও না।"

ইন্‌স্পেক্টর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আসামীর দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তা করছিলেন। তিনি রিচার্ডের কথা শুনে বললেন, "সে কথা আমি ভুলিনি রিচার্ড। অতি শান্ত-শিষ্ট চেহারার অন্তরালেও

যে অনেক সময় শয়তান বাস করে, একথা সত্যি। কিন্তু তাদের ভেতরে এমন কতকগুলো বিশেষত্ব বর্ত্তমান থাকে, যার দ্বারা তাদের আসল প্রকৃতি আমরা একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারি। আজকাল অপরাধী-সন্ধানে বিজ্ঞান আমাদের কতখানি সাহায্য করেছে, তা আশা করি তোমার অজানা নেই। মাথার গঠন, চোয়াল ও চোখ-নাক, হাতের অঙ্গুলি ইত্যাদির বিশেষত্বের সাহায্যে আমরা একজনের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারি। এসব আমার উদ্ভট কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিও না। এসব পরীক্ষিত সত্য।”

রিচার্ড গম্ভীরভাবে বললেন, “তুমি যাই বল বন্ধু, প্রমাণের চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই। প্রমাণ বিনে আধুনিক-জগতে কোন-কিছুই গ্রাহ্য হতে পারে না। আসামীর বিরুদ্ধে এমন সব মারাত্মক প্রমাণ বর্ত্তমান, যাতে তার অপরাধ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহই তোমার মনে থাকা উচিত নয়।”

এমন সময়ে জনতাকে একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে তাঁরা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, জুরীরা একে-একে ফিরে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন।

বিচারক তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মাননীয় জুরীবৃন্দ! আশা করি আপনারা আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। আপনারা এবারে সেই অভিমত ব্যক্ত করুন।”

জুরীদের নেতা দাঁড়িয়ে ধীরভাবে তাঁদের দলের অভিমত ব্যক্ত করলেন।

জুরীদের অভিমত শুনে বিচারক কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধভাবে অপেক্ষা করে সম্মুখস্থিত টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফাইলের ওপর কিছু লিখলেন। তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "জুরীদের সাথে একমত হয়ে আমি ঘোষণা করছি যে, আসামী নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তার বয়সের কথা বিবেচনা করে আমি তার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ দিলাম।"

বিচারক দণ্ডাদেশ ঘোষণা করবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের আসন ত্যাগ করে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

বিচারকের মুখে তার কঠিন দণ্ডাদেশ শ্রবণ করে আসামী বাহ্যজ্ঞান-রহিত অবস্থায় চারিদিকে তাকিয়ে তার নিজের প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল। ক্রমে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা দারুণ নিরাশা এবং আতঙ্কের চিহ্ন। কিন্তু সেই ভাব তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। নিরাশা ও আতঙ্কের ছাপ অন্তর্হিত হয়ে সেই স্থান অধিকার করল মূর্ত্তিমান ঘৃণা এবং প্রচণ্ড ক্রোধ।

প্রহরীর আদেশে কাঠগড়া থেকে নামতে-নামতে সে উন্মাদের মত প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল। তারপর তার সেই ভয়াবহ হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে নিজের মনেই বলে

উঠল, "চমৎকার অভিনয়, সন্দেহ নেই! আজ নরহত্যার অপরাধে এমন একজনের দ্বীপান্তরের আদেশ হল, যে স্ব-ইচ্ছায় সামান্য একটা পিঁপড়েও কোনদিন বধ করেনি! এরপর একমাত্র মূর্খই কেবল বিশ্বাস করবে যে, ভগবানের বিচার নিরপেক্ষ এবং নির্ভুল।"

পরক্ষণেই তার মুখের ভাব বদলে গেল। সে বিচারকের শূন্য-আসনের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "কিন্তু প্রত্যেক অন্যায় কাজেরই একটা বিচার আছে। সুতরাং, আজকের এই অন্যায় বিচারের যাঁরা অভিনেতা, তাদের সবাইকেই একদিন এর সাজা পেতে হবে।"

প্রহরীর আদেশে আসামী তাদের সাথে যাত্রা করবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। তার চোখে একটা উদাস এবং মায়াময় দৃষ্টি ফুটে উঠল। তারপর কোনো কথা না বলে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত আসামী বিচার-কক্ষ ত্যাগ করে আদালতের বাইরে এসে দাঁড়াল।

একখানা কালো-রংয়ের পুলিশ-ভ্যান্ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আসামীকে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেটা তার গন্তব্যপথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হল।

দুই

এই ঘটনার ঠিক একবৎসর পরে একদিন বিকেলের দিকে পোর্ট-ব্লেয়ারে নির্ব্বাসিত দুজন কয়েদী তাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে-করতে গল্প করছিল। কিছু দূরে তাদের রক্ষক জেল-ওয়ার্ডার পায়চারি করতে-করতে গম্ভীরভাবে চারিদিকে সতর্কভাবে দৃষ্টিপাত করছিল। সে-ও এককালে মারাত্মক অপরাধের জন্যে দণ্ডিত হয়ে এখানে নির্ব্বাসিত হয়েছিল। তারপর তার দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার আগেই শান্ত ও সুশৃঙ্খল ব্যবহারের জন্যে তাকে এখানকার ওয়ার্ডারের পদে উন্নীত করা হয়েছিল। সে-ও একদিন এই অপরাধীদের দলে ছিল, সুতরাং তাদের আচার-ব্যবহার তার সম্পূর্ণ নখ-দর্পণে। সে গম্ভীরমুখে পায়চারি করতে-করতে প্রত্যেক কয়েদীর কাজের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিল—যাতে কেউ গাফিলতি করতে না পারে।

তের নম্বর কয়েদী তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "তোমাকে নেহাৎ কাঁচা বলে মনে হচ্ছে যেন! হয়ত প্রথম অপরাধের ফলেই অত্যন্ত দুরদৃষ্টবশতঃ তুমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ। কিন্তু কোন্ অপরাধের ফলে তোমার এই দুর্গতি, জানতে পারি কি বন্ধু?"

যাকে লক্ষ্য করে তের নম্বর কয়েদী এই কথাগুলো বলল, সেই কয়েদী একজন যুবক। সে তার সঙ্গীর কথা শুনে তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "সেকথা শুনে তোমার কোনো লাভ হবে না। কারণ, আমার কথা তুমি পাগলের প্রলাপ বলেই মনে করবে—বিশ্বাস করতে চাইবে না।"

তের নম্বর কয়েদী এই কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির স্বরে বলল, "শুধু বয়সে নয়, মনেও তুমি এখন অবধি নেহাৎ কাঁচা দেখছি। কিন্তু তুমি তোমার কাহিনী আমার কাছে অনায়াসে ব্যক্ত করতে পার বন্ধু! আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই অমূল্য সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছি যে, মানুষ যত বেশী বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী হয়, তার ভেতরে পাগলামীও তত বেশী থাকে। অবশ্য এখানে একথা স্বীকার করতে হবেই যে, আমরা প্রত্যেকেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মত্ত। কিন্তু সে-সব তত্ত্বকথা থাক্। তোমার কাহিনী ব্যক্ত করতে পার।"

তার সঙ্গী নির্ব্বিকারভাবে বলল, "আমার অপরাধ এই যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। হ্যাঁ! একমাত্র এই কারণেই আমি আজ নির্ব্বাসিত।"

তের নম্বর কয়েদী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তা তুমি এই অবিচার বিনা প্রতিবাদে সয়ে গেলে?"

তার সঙ্গী উত্তর দিল, "হ্যাঁ। এই অবিচারের কোনো প্রতিকার করা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আইনের

দোহাই দিয়ে যে অবিচার হয়, তার কি কোনো প্রতিকার সম্ভব বলে মনে হয় তোমার ?”

তের নম্বর কয়েদী গম্ভীরমুখে বলল, “তা বটে ! কিন্তু সেই অবিচারের বোঝা তুমি কি চিরদিন সয়ে যাবে বন্ধু ?”

তার সঙ্গীর মুখে এক টুকরো নিরাশার মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, “তা ছাড়া আর উপায় কি বল ? আমার বিচারের জের শেষ হলে—সুরু হবে তাদের অপরাধের বিচার। কিন্তু তখন তার পেছনে থাকবে না কোনো আইনের দোহাই। শুধু মাত্র থাকবে আমার নিজের প্রতিহিংসা এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবন-শক্তি। সুতরাং মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত—”

তের নম্বর কয়েদী গম্ভীরস্বরে বলল, “তুমি মুক্তিলাভ করতে চাও ? আমি তোমায় বিদ্রূপ করছি না একথা স্মরণ রেখ। সুতরাং খুব ভাল করে ভেবে আমার কথার উত্তর দাও।”

তের নম্বর কয়েদীর সঙ্গী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, “কিন্তু আমাকে মুক্তি দেবে কে ? তুমি ?”

তের নম্বর দৃঢ়স্বরে বলল, “হ্যাঁ। তুমি মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছা যদি মনে-মনে পোষণ করে থাক, তবে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। আর ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই প্রচণ্ড জল-ঝড় আরম্ভ হবে। সন্ধ্যা হতেও এখন প্রায় ঘণ্টাখানেক

দেরী। সুতরাং সন্ধ্যার সাথে-সাথে পৃথিবীর বুকে সুরু হবে রুদ্র-প্রকৃতির প্রচণ্ড লীলা। এবং সেই অবসরে—"

কথা শেষ না করে সে তার সম্মুখস্থিত সঙ্গীর দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

তার সঙ্গী আকাশের রক্তবর্ণ মেঘের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে, তার কথা মিথ্যা নয়—সন্ধ্যা সুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক ঝড় উঠবে। তার সঙ্গীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার মনেও দারুণ ঝড় উঠল। এই অপূর্ব্ব সুযোগ ত্যাগ না করে তার সঙ্গীর সাথে পলায়ন করলে এ-যাত্রা হয়ত সে রক্ষা পেতেও পারে। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি অবধারিত। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট মুক্তিদিনের প্রতীক্ষায় থাকার চেয়ে, নিজের চেষ্টায় তার পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।...অন্যায় ?

তার মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠল। এখানে তার আগমনের ভিত্তিও ত অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সে-ই বা কেন অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে না ? কে বলতে পারে যে, এই অপূর্ব্ব সুযোগ ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে সে কোনোদিন আদৌ মুক্তিলাভ করতে পারবে কি না ?

মনে-মনে নানা কথা বিচার করে, সে তার সঙ্কল্প স্থির করে তার সঙ্গীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, "আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি।"

তার সঙ্গী আড়চোখে অদূরে দণ্ডায়মান ওয়ার্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "বহুত আচ্ছা! আমি জানি তুমি এমন সুবর্ণ-সুযোগ অবহেলা-ভরে ত্যাগ করবে না। তুমি তৈরি থেক। ইঙ্গিতমাত্র তুমি বিনা প্রতিবাদে আমার আদেশ পালন করবে।"

পরদিন সকালে পোর্ট-ব্লেয়ার কারাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একখানা জরুরী আদেশ পেয়ে বিস্মিত হলেন। সেই আদেশ-পত্রে সাতাশ নম্বর কয়েদীর মুক্তির আদেশ ছিল। যে-মামলায় সে হত্যাপরাধে দণ্ডিত হয়ে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, তার প্রকৃত আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে। তার প্রতি এই ভুলকৃত অবিচারের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবার নির্দ্দেশ তাতে দেওয়া ছিল।

সেই আদেশ-পত্র হস্তগত করে অধ্যক্ষের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি ভারিক্কি-চালে মাথা দুলিয়ে বললেন, "আমার মনে আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে, ছোকরা হয়ত ভুল-পথে চালিত হয়ে কোনো অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। এখন দেখছি তাও নয়—সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

অধ্যক্ষ দ্রুতপদে একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তার ভেতরে প্রবেশ করে সাতাশ নম্বর কয়েদীর খোঁজ করতেই তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। কারণ, ঘর খালি—কেউ নেই!

তৎক্ষণাৎ সুরু হল সাতাশ নম্বর কয়েদীর অনুসন্ধান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সে তখন সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ!

অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে আরও একটি নূতন তথ্য প্রকাশ পেল। সাতাশ নম্বর কয়েদীর সাথে-সাথে তের নম্বর কয়েদীও জেল থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

অধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি তাঁর কক্ষে ফিরে এসে সেই দুজন পলাতক কয়েদীর সন্ধানের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

ফোনের সাহায্যে চারিদিকে এই সংবাদ প্রচার করে তিনি ক্লান্তভাবে টেবিলের ওপর রিসিভারটা রেখে মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, "অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! মুক্তির সংবাদ পাওয়ার সাথে-সাথে প্রকাশ পেল সে পলাতক। নিয়তির কি অদ্ভুত রহস্য!"

তিন

ঐ ঘটনার দুইবৎসর পরের কথা।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রমেশ দত্তের প্রাসাদ একটা প্রকাণ্ড জমির উপর অবস্থিত। চারিদিকের বাগানে ফুল-ফল এবং বিলিতী সৌখীন গাছ। বাড়ীর পেছনে প্রকাণ্ড টেনিস্ লন্। মাঝখানে মার্বেল-পাথর-খচিত প্রাসাদ। বাড়ীটা দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ীর মালিক যথেষ্ট সৌখীন ব্যক্তি এবং সকলেই জানে, তাঁর সেই বিলাস চরিতার্থ করবার মত অর্থেরও কোনো অভাব নেই।

রাত প্রায় ৯টা। এমনি সময়ে একখানি ট্যাক্সি বাড়ীখানির দরজায় সশব্দে এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ী থেকে বেরুলেন ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্ক রায় ও ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ড। আর তাঁদের সঙ্গে বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেকটিভ বারীন চাটার্জ্জি ও তার সহকারী সুজিত রায়।

জমিদার ও ব্যাঙ্কার লছমীপ্রসাদের বাড়ীতে তাঁরা সবাই যখন নিমন্ত্রণ-রক্ষায় ব্যস্ত, সেই সময় পুলিশ-কমিশনারের কাছ থেকে টেলিফোনে এক জরুরী নির্দেশ পেয়ে ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্কবাবু তাঁর অপর সঙ্গীদের নিয়ে এইখানে এসে হাজির হয়েছেন।

কমিশনার ফোন করে বলেছেন, "এইমাত্র খবর পেলুম,

রায়বাহাদুর রমেশ দত্ত খুন হয়েছেন। আপনি ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ডকে নিয়ে এখুনি সেখানে চলে যান ও উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করুন।”

প্রাইভেট-ডিটেকটিভ বারীন চাটার্জ্জি ও তার সহকারী সুজিত রায়ও ছিল নিমন্ত্রিত-অতিথিদের অন্যতম। শশাঙ্কবাবু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরাও চল না বারীন!”

বারীন বলল, “না না,—আমরা যাব কেন? আমরা তো পুলিশের কেউ নই!”

—“তোমরা পুলিশের মাসতুতো ভাই!” এই বলে শশাঙ্কবাবু বারীনের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, “ও-সব ওস্তাদি বন্ধ রাখ। দুদিন পরে তো তোমাকেই এর ভার নিতে হবে বন্ধু! চল না, আগে থেকেই দেখে রাখ।”

বারীন আর আপত্তি না করে, তার সহকারীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সঙ্গ নিলে।

ট্যাক্সিটাকে বিদায় দিয়ে, সঙ্গীদের নিয়ে শশাঙ্কবাবু গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

গেট পার হয়েই দুদিকে সারি-সারি নানাজাতীয় ফুলের গাছ—মাঝখান দিয়ে সরু লাল কাঁকর-বিছানো রাস্তা। শশাঙ্কবাবু সদলবলে সেই রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার সামনে একজন আর্দ্দালী দাঁড়িয়ে ছিল। শশাঙ্কবাবু তাকে বললেন, “ভেতরে কে আছে, খবর দাও।”

আর্দ্দালী শশাঙ্কবাবুর সাধারণ পোষাকের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ ভেতরে অদৃশ্য হল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে আবার ফিরে এল—সাথে একজন যুবক।

শশাঙ্কবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ইন্‌স্পেক্টর রায়—থানা থেকে আসছি।"

যুবক সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বলল, "আসুন।"

যুবকের পিছু-পিছু শশাঙ্কবাবু সদলে অগ্রসর হয়ে ভেতরে একটা হল্‌ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতরে একজন প্রবীণ ডাক্তার এবং কয়েকজন পরিচারক উপস্থিত ছিল। তারা তাদের দেখে সরে দাঁড়াল।

ঘরের মাঝখানে খাটের উপর শায়িত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। শশাঙ্কবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলেন।

দেখা গেল, রায়বাহাদুর রমেশ দত্তের মুখমণ্ডল বিবর্ণ, তাঁর কণ্ঠনলী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেল, রায়বাহাদুর তাঁর দৈনিক অভ্যাসের মত আজও একাকী বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বেরুবার ঘণ্টাখানেক পরে, সম্ভবতঃ বাড়ীতে ফিরে আসবার পথে, হঠাৎ তাঁর আর্ত্তনাদ শুনে বাড়ীর লোকজন সেইখানে ছুটে যায়।

তারা যেয়ে দেখে, বাড়ীর কাছেই, ঐ আমবাগানের পথে একটা নির্জ্জন জায়গায় তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর কণ্ঠনলী দিয়ে তখনো দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

কিছুই তিনি বলতে পারেন নি—এক মুহূর্ত্ত ছটফট করে তিনি নিস্পন্দ হয়ে যান। তারপর সকলে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

ডাক্তার বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন, "আক্রান্ত হয়ে কণ্ঠনলী ছিন্ন হবার সাথে-সাথেই মৃত্যু ঘটেছে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "কিন্তু কেমন করে তিনি যে এমন মারাত্মকভাবে জখম হলেন তা বুঝতে পারছি না। এ কি কোনো কুকুর বা বন্য-জন্তুর দংশন? না, কোনো অস্ত্রের আঘাত? দেখে মনে হচ্ছে, সাঁড়াশি-জাতীয় কোনো জিনিষের চাপে তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে।"

হঠাৎ একটা কিছুতে নজর পড়তেই ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ড সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অতি সাবধানে নিহত ব্যক্তির বুকের কাছ থেকে সেটা তুলে নিলেন।

সবাই দেখতে পেলে, জিনিষটি ছোট একটুকরো কাগজ—পিন দিয়ে জামার সাথে আঁটা। কাগজটার ঠিক মাঝখানে একটা সাঁড়াশির ছবি। তার ঠিক নীচেই লেখা রয়েছে অদ্ভুত একটা সংখ্যা "৮—১"।

ইন্‌স্পেক্টর রিচার্ড, বারীনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "এই চিহ্ন আর এই সংখ্যা দুটোর রহস্য সমাধান করতে পারেন মিঃ চাটার্জ্জি?"

বারীন সেই কাগজটাকে দু'তিনবার উল্টে-পাল্টে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার ভানে বলল, "না, মিঃ রিচার্ড! এই সামান্য এক টুকরো

কাগজ দেখে কোনো রহস্যের সমাধান করা আমাদের মত নিরেট গোয়েন্দার কাজ নয়। ওসব গবেষণা হয়তো মোটা-বেতনের পুলিশ-কর্ম্মচারীদের পক্ষেই সম্ভব।"

শশাঙ্কবাবু বুঝলেন, বারীনের এই মন্তব্য তীব্র টিপ্পনি মাত্র; আর সে তা প্রয়োগ করেছে, তাঁকে আর রিচার্ডকে লক্ষ্য করেই।

বিরক্তিসূচক একটা ঝঙ্কার দিয়ে তিনি বললেন, "তোমার কি সব-সময়েই মানুষকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা একটা অভ্যাস? আমরা এসেছি একটা খুনের তদন্ত করতে—অথচ কোনো সূত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় এ-অবস্থায় তোমার একটু সাহায্য পাব আশা করছি, তা নয় এখনো তোমার যত নোংরা ব্যবহার!"

মৃদু হেসে বারীন বলল, "কিন্তু আপনি যে বড্ড ভুলে যাচ্ছেন শশাঙ্কবাবু, তদন্তটা আপনাদের—আমাদের নয়। এ-ব্যাপারে দন্তস্ফুট করতে পারি, আমাদের সে অধিকার নেই। বিশেষতঃ আপনাদের তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।"

"শেষ হয়নি?" শশাঙ্কবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন। "শেষ হবার আর বাকি রয়েছে কি বল ত? রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন; কিন্তু সে কোনো মানুষের দ্বারা, না অপর কোনো জীব-জন্তুর দ্বারা, তার কোনো সমাধান হতে পারে না। কাজেই বিশেষ কিছুই করবার মত এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। কেবল আম-বাগান থেকে যাঁরা এঁকে নিয়ে

এসেছে, এখন শুধু তাদের নাম-ধাম আর পরিচয়টা টুকে নিলেই আমাদের কাজ হয়ে যায়।”

—“বটে! কেবল সেইটুকু?” প্রশ্ন করেই বারীন হেসে ফেলল।

—“তা বই কি! তুমি হলে আর কি করতে, শুনি?” শশাঙ্কবাবু বিরক্তির সাথে জিজ্ঞাসা করলেন। দেখা গেল, মিঃ রিচার্ডের মুখও গম্ভীর—তাঁর মুখেও যেন সেই জিজ্ঞাসা!

মৃদু হেসে বারীন বলল, “তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে তদন্তের প্রথম সূত্রটা আমিই বার করে দিচ্ছি ইন্‌স্পেক্টরবাবু! আপনি কেবল সেই বাহকদের ডেকে পাঠান।”

শশাঙ্কবাবুর আদেশে বাড়ীর সেই লোকদের তখুনি ডেকে পাঠানো হল; তাদের একজন রায়বাহাদুরের কেরাণী, আর দুজন বাড়ীর দুটো চাকর।

বারীন তাদের জিজ্ঞাসা করে যা জানতে পারল, তা হচ্ছে এই:

আর্ত্তনাদ শুনেই তারা সেদিকে ছুটে চলে যায়। গিয়ে দেখে, রায়বাহাদুর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তখনো একটু-একটু কাতরাচ্ছেন। কিন্তু সে কেবল সামান্য দু’এক মুহূর্ত্ত, তারপরেই সব চুপ।

এরা তখন রায়বাহাদুরকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে, বাড়ীর দিকে বয়ে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর স্থূল দেহ বয়ে আনা তো সহজ কথা নয়! কাজেই তাদের খুবই কষ্ট

হচ্ছিল। দৈবাৎ সেইখান দিয়ে এক ভদ্রলোক কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের এতটা কষ্ট দেখে, দয়া করে নিজেও এসে সাহায্য করেন। সে ভদ্রলোক সাহায্য না করলে, ওঁকে এখানে নিয়ে আসাই কষ্টকর হত।

ভদ্রলোক এত দয়ালু যে, শুধু বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি; তিনি ওঁকে ওপরে তুলে, এই বিছানায় শুইয়ে দিয়ে,—তবে চলে গেছেন।

বারীন জিজ্ঞাসা করল, "সেই ভদ্রলোকের নাম-ধাম বা কোনো পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

—"না। কারণ, আমাদের তখন সেকথা মনেই হয়নি।"

—"আচ্ছা, বুকে-আঁটা ঐ কাগজটা তোমাদের চোখে পড়ল কখন?"

—"সে-কথা ভাল করে মনে হচ্ছে না। আম-বাগানে থাকতেই হয়তো ওটা ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ চোখে পড়েনি। বিশেষতঃ তখন আমরা এতই আতঙ্ক-গ্রস্ত আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম যে, বুকে ওটা থাকলেও আমাদের চোখে না পড়াই ছিল স্বাভাবিক।"

—"হাঁ, তা বটে। আচ্ছা, সেকথা যাক। কিন্তু বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার খানিক পরে যে ওটা চোখে পড়েছিল, সেকথা নিশ্চয়ই মনে আছে। কেমন, তাই নয় কি?"

—"আজ্ঞে হাঁ।"

বারীন হেসে ফেলল। তারপর এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে

আবার জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা নিহত রায়বাহাত্নরকে ঐ ঘটনাস্থল থেকে টেনে-হিঁচড়ে এইখানে নিয়ে এলে কেন? পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত দেহটা সরিয়ে ফেলা তোমাদের পক্ষে উচিত হয়েছে কি?"

তারা এবার কি জবাব দেবে, তার কিছুই ঠিক করতে পারলে না। অবশেষে—খানিকক্ষণ পরে একজন বলল, "এখন মনে হচ্ছে, কাজটা আমাদের পক্ষে উচিত হয়নি। কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে ধর্ম্মতঃ বলছি, আমাদের কোনো খারাপ মতলব ছিল না। আমরা মুখ্যু মানুষ, ভাল-মন্দ বেশী কিছু বুঝতে পারি না। কর্ত্তার চীৎকার শুনে আর তারপর তাঁর এমন অবস্থা দেখে, আমরা আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। তবে এখন বেশ বুঝতে পারছি, পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত তাঁর দেহটা সেইখানে রাখাই উচিত ছিল। আমাদের অপরাধ নেবেন না বাবু, আমাদের ক্ষমা করুন।"

মৃত্ন হেসে বারীন বলল, "আচ্ছা, যাও তোমরা। এখন আর তোমাদের কোনো দরকার নেই।"

এরপর খানিকক্ষণ সবাই নীরব। বারীন চিন্তিতভাবে বাঁ-হাত দিয়ে নিজের কপালখানি কয়েকবার বুলিয়ে নিল; তারপর হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল এমনিভাবে শশাঙ্কবাবুকে বলল, "আমার প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়েছে ইন্‌স্পেক্টরবাবু! এখন চলুন বাড়ী যাওয়া যাক।"

বিস্মিতভাবে শশাঙ্কবাবু বললেন, "তুমি যে বড্ড বড়াই

করে বলেছিলে যে, প্রথম সূত্রটা তুমিই ধরিয়ে দেবে, তার কি হলো বারীন ?"

—"হাঁ, সে আমি এখনো পারি। বলুন, আপনি এখন কিসের সূত্র পেতে চান ?"

—"প্রথমে বল, রায়বাহাদুরের এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে ? কোনো মানুষ, না অপর কোনো জীব ?"

—"মানুষ।"

—"মানুষ ?"

—"হাঁ।"

—"তার প্রমাণ ? কে করেছে ?" শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠে যেন বাজ ডেকে উঠলো।

বারীন বলল, "কে করেছে ঠিক সেই লোকটিকে খুঁজে দেওয়া এখুনি সম্ভব নয়। তবে যে-বন্ধুটি ওঁকে এখানে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন, এই হত্যাকাণ্ড করেছেন তিনি বা তাঁরই দলের কোনো লোক।"

—"কি বলছ তুমি ? সেই দয়ালু ভদ্রলোক ?"

—"হাঁ, সেই দয়ালু ভদ্রলোকই এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। রায়বাহাদুরের বুকে তখন পর্য্যন্ত এই কাগজখানা আঁটা হয়নি বলে, সাহায্যকারী হিসেবে তাঁকে বাড়ী পর্য্যন্ত আসতে হয়েছিল। এখানে ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দেবার সময় সকলের অজান্তে তিনি কাগজখানা এঁটে দিয়ে গেছেন।"

রিচার্ড ও শশাঙ্কবাবু খানিকক্ষণ সকলেই আবার নীরব। তারপর এবার কথা বললেন রিচার্ড। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এই কাগজের সংখ্যাটির কি কোনো মানে হয় মিঃ চাটার্জ্জি ?"

—"নিশ্চয়ই হয়। এর মানে হচ্ছে, আরো ভয়ানক গুরুতর কাজ আপনাদের সম্মুখে পড়ে আছে। খুনী আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছে, খুনের মোট সংখ্যা হবে সর্ব্বশুদ্ধ আটটি এবং এইমাত্র তার প্রথম সংখ্যা। 'আট বিয়োগ এক' (৮—১) লিখে সে সদর্পে সেই কথাই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছে।"

—"এর কোনো প্রমাণ আছে [illegible] ?"

—"না। এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু অনুমান হলেও, আশা করি অভ্রান্ত অনুমান।"

শশাঙ্কবাবু এবার যেন কোনো হারানো সূত্র খুজে পেলেন। তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "হাঁ, তোমার কথাগুলো যেন সত্যি বলেই মনে হয়। তাহলে আরো সাতটি খুন হবে এই হচ্ছে তোমার ধারণা, কেমন ? কিন্তু এখন ভেবে বার করতে হবে, কারা ঐ হতভাগ্য সাতজন !"

মৃদু হেসে [illegible] বলল, "সে আপনি বার করুন শশাঙ্ক-বাবু ! কিন্তু এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—বন্ধুভাবেই বলে যাই···

আজ এইমুহূর্ত্ত হতেই চারিদিকে নজর রেখে, বেশ সাবধান হয়ে চলাফেরা করবেন। কারণ, যারা আটটা খুন

করবার নিশান উঠিয়েছে, তাদের পক্ষে—দরকার হলে আর একটা বেশি খুন করা একেবারেই কষ্টকর হবে না।

আপনি এই খুনের তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর, সুতরাং, আপনাকে খুন করায় তাঁদের লাভ বই ক্ষতি নেই কিছুমাত্র।"

বারীন এই বলে হন্‌হন্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেরুবার আগে সে সুজিতকে বলল, "তুমি দু'মিনিট পরে এসো সুজিত। মানে, আমি খানিকটা এগিয়ে গেলে তুমি আমার অনুসরণ করবে, এই হচ্ছে আমার অভিপ্রায়। কিন্তু চোখ-কান বেশ সজাগ রেখো, আর দরকার হ'লে রিভলভার ব্যবহার করতে ভুলো না।"

বারীনের শেষ কথাগুলো সকলের কানেই যেন রহস্যের মত শোনালো। সকলেই স্তম্ভিতভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

চার

বারীন ঐ বাড়ী থেকে বেরুবার বোধহয় আধ-ঘণ্টা মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তার সাবধান-বাণীর যথার্থই কিছু মূল্য আছে।

ভাগ্যিস্ সুজিত তার কথামত বারীনের দু'মিনিট পরেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল! আর বারীন তাকে অত সাবধান করেছিল বলেই সুজিত তার চোখ-কানগুলো সতর্ক রেখেই চলছিল! নইলে যে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াতো তা কে জানে?

বারীন বাড়ী থেকে বেরিয়েই তার মোটরে চেপে বসল, সাথে-সাথে ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ গাড়ী চালিয়ে দিল। বারীন গাড়ীর ভেতরে না বসে ড্রাইভারের পাশেই বসেছিল। কেন সে তা করলে, ড্রাইভার তা জানতে কৌতূহলী হলেও কোনো প্রশ্ন করলে না। কারণ, এই সুদীর্ঘকাল বারীনের চাকরি করে ড্রাইভার বুঝে নিয়েছিল যে, তার এই মনিবটি এক অপরূপ চরিত্রের লোক। তার ব্যবহার ও চাল্-চলতি অনেক সময়ই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে; কিন্তু কোনো-কোনো সময়ে প্রমাণিত হয়েছে, তার বেখাপ্পা ব্যবহার বা চাল্-চলতির অন্তরালে বিশেষ কোনো কারণ লুকানো ছিল,

আজও হয়তো সেইরকম কোনো ব্যাপারই হয়ে থাকবে, এই মনে করে ড্রাইভার তাকে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করলে না। বিশেষতঃ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কৌতূহলের বশে তাকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করা তার বারণ ছিল।

গাড়ী ছুটে চলল পূরো বেগে,—কিন্তু সে মাত্র দু'এক মিনিটের জন্য। বারীন তার ড্রাইভারের পাশে বসে কেবলই হর্ণ বাজিয়ে যাচ্ছিল।

ড্রাইভার বারীনের এই কাণ্ডেও বড্ড বেশী বিস্ময় বোধ করল। কারণ, রাত অন্ধকার হ'লেও মোটরের হেড্‌লাইটে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল পথ-ঘাট একদম পরিষ্কার—কোথাও কিছুই নেই। তাহলে এমন উন্মাদের মত ঘনঘন হর্ণ বাজিয়ে যাচ্ছে কেন বারীন ?

হঠাৎ সে গাড়ী থামালো বারীনের আদেশে। বারীন বলল, "আর হর্ণ বাজিও না, নিঃশব্দে গাড়ী পেছন দিকে চালিয়ে নিয়ে যাও—রায়বাহাদুরের বাড়ীর দিকে। পথে সুজিতকে দেখলেই গাড়ীতে তুলে নিও, বেচারা সম্ভবতঃ হেঁটেই আসছে। তারপর গাড়ীখানা আমাদের বাড়ীর দিকে চালিয়ে যেও।

আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলো, তিনি রাস্তার মাঝখানে নেমে কোথায় চলে গেলেন। আমি এখন এই বনটার ভেতর দিয়ে এগুবো—আমার জন্য কিছু ভেবো না। কিন্তু কোনো বিপদ হলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করো।

এই রিভলভারটা রাখো। আমার কাছে আর-একটা আছে।”

এই বলে বারীন তাকে একটি রিভলভার দিয়ে নিঃশব্দে বাঁধানো-রাস্তা থেকে নেমে ডান-পাশে বনের দিকে এগিয়ে গেল। ড্রাইভার অবাক হয়ে, বারীনের কথামত নীরবে পেছন দিকে ব্যাক্ করতে লাগল।

তার কেমন যেন একটা সন্দেহ হ'তে লাগল···বারীন-বাবুর মাথার ঠিক্ আছে তো? গাড়ীতে উঠেই তার ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করা—ঘনঘন হর্ণ বাজানো—হঠাৎ অন্ধকারে নেমে যাওয়া—বিপদের আশঙ্কা করে রিভলভার দেওয়া—পেছন দিকে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া—এর সব-কিছুতেই যেন একটা অস্বস্তির ভাব!

কিন্তু কিসের অস্বস্তি? কিসের আশঙ্কা? গোয়েন্দাগিরি করলে কি লোকে হাওয়ার ভেতরেও খুন-জখমের গন্ধ পায়? যা হোক্, তবু সে রিভলভারটা তার কোলের কাছে ডানদিকে শুইয়ে রাখলো। কি জানি, যদিই বা কোনো আপদ-বিপদ এসে পড়ে!

মাত্র কয়েক মিনিট পরে।

সুজিত ছুটে আসছে বারীনের মোটরে—সুমুখের সীটে বসে গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার রামদীন। রামদীনের পাশে তখনো সেই রিভলভার, আর সুজিত তার রিভলভার হাতে

নিয়েই গাড়ীতে উঠে বসল। কারণ, তখনো তার কেবলই মনে হচ্ছিল বারীনের কথা।

বারীন তাকে সাবধান করে বলেছিল, "চোখ-কান সজাগ রেখো, আর দরকার হলে রিভলভার ব্যবহার করতে ভুলো না।"

বারীন অতি সতর্ক শিকারী-কুকুরের মত কেবলই এদিক্-ওদিক্ তাকাচ্ছিল, এম্‌নি সময়ে গাড়ীখানা হঠাৎ একবার ভয়ানকভাবে লাফিয়ে উঠলো।

—"কি এ?" জিজ্ঞাসা করলে সুজিত।

—"কে রাস্তা কেটে রেখেছে বাবু। গভীর নর্দ্দমা। আগে তো এটা ছিল না বাবু!" বলে রামদীন সেই নর্দ্দমার ওপর দিয়েই শক্ত-হাতে গাড়ী চালিয়ে নিলে; গাড়ী আর-একবার ভয়ানকভাবে কেঁপে নর্দ্দমার ওপরে উঠে গেল।

হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ—"ওরে বাপ্!"

তড়াক্ করে তিনটি লোক গাড়ীর ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠেছে, আর তাদেরই একজন রামদীনকে এক-ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছে।

সুজিতের রিভলভার মুহূর্ত্তের মধ্যে গর্জ্জন করে উঠলো। কিন্তু সম্ভবতঃ অন্ধকারে ও উত্তেজনায় সে লক্ষ্য ঠিক করতে পারেনি—গুলি ব্যর্থ হল। লোকটা তখুনি ফিরে দাঁড়িয়ে সুজিতের মাথায় মারলে এক ঘুষি, আর বাকি দু'জন ছুটে এলো সুজিতের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে।

অসহায় সুজিত! ঘুষির সাথে-সাথেই সে কপালে ও চোখে আহত হয়ে নিজের সীটেই এলিয়ে পড়লো। কিন্তু তখুনি—অতি কাছেই কোথেকে প্রচণ্ড শব্দে আবার এক-ঝলক আগুন এলো—পরক্ষণেই আবার এক-ঝলক!

মুহূর্ত্ত মধ্যেই আক্রমণকারীরা কে-কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল!

আপাদ-মস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে বারীন তৎক্ষণাৎ কোন্ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই ড্রাইভারকে পাশে ঠেলে দিয়ে নিজে তার জায়গায় বসে পড়লো, তারপর গাড়ীর ষ্টীয়ারিং চেপে ধরে বাড়ীর দিকে গাড়ী চালিয়ে দিল।

দুশ্চিন্তায় ও পরিশ্রমে বারীনের কপালে তখন অজস্র ঘাম ফুটে বেরিয়েছে!

পাঁচ

সুজিতের মাথায় ব্যাণ্ডেজ, সর্ব্বশরীরে তখনো তার প্রচণ্ড ব্যথা, সে চেষ্টা করেও পাশ ফিরতে পারলে না। একবার শুধু মৃদুকণ্ঠে বলল, "জল!"

—"জল? জল খাবে সুজিত? দিচ্ছি—আমি দিচ্ছি।" বলেই ঘরে ঢুকলো বারীন।

ঘরের এক কোণে একটা জলের কুঁজো। সে তা থেকে কাঁচের গ্লাসে একটু জল ঢেলে নিলে, তারপর অতি ধীরে ধীরে সুজিতের মুখে ঢেলে দিতে লাগলো।

জল খেয়ে একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুজিত বলল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বারীন?"

বারীন বলল, "ঘরের সামনেই রকের ওপর বসে তোমায় পাহারা দিচ্ছিলুম সুজিত!"

সুজিত বলল, "আমার একটি প্রশ্ন আছে বারীন! তার জবাব দিয়ে আমায় আগে নিশ্চিন্ত কর দেখি!"

হেসে বারীন বলল, "তোমার এখন বেশী কথা বলা উচিত নয়। কাজেই, তোমার প্রশ্নটি মনে মনে আঁচ্ করে নিয়ে আমিই তার জবাব দিচ্ছি।

তোমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তোমায় সাবধান করেছিলুম কেন? কোনো বিপদের গন্ধ আমি আগেই পেয়েছিলুম কি?

…হাঁ, আমি বিপদের গন্ধ কিছু আগেই পেয়েছিলুম। রায়-বাহাদুরের বাড়ী যাবার পথে, আমি তাঁর বাড়ীর কাছেই কয়েকটি লোক দেখতে পাই। তাদের পরণে হাফ-প্যান্ট, গায়ে হাফ-শার্ট। তোমার মনে আছে হয়তো, আমি মাঝে-মাঝে টর্চের আলো ফেলে চারদিকটা বেশ ভাল করে দেখে নিচ্ছিলুম? আমার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, যদি কোনো আভাস পাওয়া যায়।

আমি টর্চের আলোয় দেখলুম, ওদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রায়বাহাদুরের বাড়ীর ফটকটা। ফটকের আলোতে তারা দেখছিল, খুনের পরক্ষণেই সেই বাড়ীতে কয়জন লোক ঢোকে এবং কে কে ঢোকে।

সাধারণতঃ পুলিশের ইউনিফর্মে অনেকের চেহারাই এক-রকম মনে হয়।

বড়-জোর বাঙ্গালী কি সাহেব, এইটুকু পার্থক্যই করা যায়। কিন্তু তাদের মুখ-চোখ চিনে রাখা কঠিন। কাজেই মনে হল, ইন্স্পেক্টর শশাঙ্ক বোস আর মিঃ রিচার্ডের ছবি চিনে রাখা বেশী সহজ নাও হতে পারে। আর চিনে রাখলেও এখুনি তাদের ওপর বেশী নজর না দেওয়াই হচ্ছে স্বাভাবিক।

কিন্তু কাদের ওপর বেশী নজর রাখা আবশ্যক? সে হচ্ছে আমাদের ওপর। তার কারণ, এমন একটা খুনের ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে যারা ঘটনাস্থলে যেতে পারে বা যাবার অনুমতি

পায়, তারা নিশ্চয়ই সাধারণ লোক নয়! তারপর, আমাদের পরিচয় হয়তো তাদেরও একেবারেই অজানা রয়নি।

পরক্ষণেই মনে হ'ল, আমাদের ওপর যদি কোনো অত্যাচারের চেষ্টা হয়, সে হতে পারে কোথায়? একটু ভাবলেই বুঝবে, তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে গাড়ী যখন বনের পাশ দিয়ে যাবে ঠিক সেই পথটা।

কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কিরকম ফাঁদ পাতা হয়েছে সে তো জানি না! তবু মনে হ'ল আমরা দু'জনেই ফাঁদে পা বাড়াই কেন? কাজেই, তোমাকেই দিতে হ'ল এগিয়ে, আমি নিজে তৈরি হয়ে রইলুম সেই বনের ভেতরে।

রাস্তাটার দিকে লক্ষ্য রেখে বনপথে এগিয়ে যাবার সময় আমার চোখে পড়েছিল যে, হঠাৎ সেই বাঁধানো-রাস্তার ওপরেই একটা শুক্‌নো খাল গজিয়ে উঠেছে। আমি তখুনি বুঝতে পারলুম, এ শুধু গাড়ী আট্‌কাবার ফন্দী।

তোমাকে আর সাবধান করবার উপায় ছিল না সুজিত! কাজেই সেই খালটার কাছেই আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম। তারপর যে কি ঘটেছে, তুমিও তা জানো।"

সুজিত আর কিছুই বললে না, কেবল চোখ বুজে পড়ে রইল।

বারীন কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে সুজিত বলল, "কিন্তু এখন তাহ'লে আমাদের কি করতে হবে বারীন?"

—"কিছুই নয়।" বারীন গম্ভীরভাবে বলল, "আমরা আর

কিছুই করব না সুজিত! কারণ, সেদিন যে আমরা গিয়েছিলুম, সে হচ্ছে শুধু একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে! প্রকৃতপক্ষে এ-ব্যাপারে আমাদের কোনো অধিকারই নেই। পুলিশের ব্যাপার, পুলিশই তদন্ত করবে। মাঝে থেকে আমাদের লাভ হ'ল এইটুকু যে, তুমি আজ আহত হয়ে পড়ে আছ। পরের ব্যাপারে হাত দিয়ে চমৎকার লাভ হাতে নিয়ে ফিরে এলুম। এখন আর কেন? যাদের ব্যাপার তারাই দেখবে।"

—"কিন্তু তারা যদি তোমার সাহায্য চায় বারীন?" বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলেন ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্কবাবু।

—"এই যে, খবর কি ইন্‌স্পেক্টরবাবু?" বারীন হাসি-মুখে অভ্যর্থনা করল।

—"খবর শুনতে চাও? শোনো তবে। আবার একটা খুন হয়েছে; এবারকার শিকারের নাম রায়বাহাদুর হরলাল চৌধুরী। মৃত্যুর পরে তাঁর গায়ে লেবেল আঁটা ছিল ৮—২; অর্থাৎ আটটির মাঝে দুটি সাবাড় হয়ে গেল।"

—"তা আমি কি করব?" উদাসীনভাবে বারীন প্রশ্ন করল।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "কি আর করবে? তুমি আমাদের সাহায্য করবে। পুলিশ-কমিশনার সাহেব আমাকে লিখেছেন তোমার সাহায্য নিতে, আর তোমায় অনুরোধ করেছেন আমাদের সাহায্য করতে,—এই নাও সেই চিঠি।" এই বলে শশাঙ্কবাবু বারীনের হাতে একখানি চিঠি দিলেন।

হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ—"ওরে বাপ্ !"

পৃষ্ঠা—২৭

বারীন চিঠিখানি জোরে-জোরেই পড়ল সুজিতকে শোনাবার জন্যে।

টাইপ্-করা ইংরেজী চিঠি, নীচে কমিশনার-সাহেবের স্বাক্ষর। তিনি বারীনকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "এখন তাহ'লে আর তোমার তরফ থেকে কোনো আপত্তিই উঠ্‌তে পারে না বারীন! তোমার পারিশ্রমিক তুমি অন্যান্যবারের মত এবারেও কমিশনার-সাহেবের সঙ্গেই কথা কয়ে মিটিয়ে নেবে। কেমন, রাজী ত?"

বারীন খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, এখন এ-কাজে হাত দেওয়া আমার পক্ষে অশোভন হবে না,—কারণ, আমাকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুজিত সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুই করতে পারব না ইনস্পেক্টরবাবু!"

—"বেশ, কাজে হাত তুমি দুদিন পরেই দিও। এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে তা ভালো করে শুনেই রাখ না। আমি এক ভদ্রলোককে তোমার অনুমতির অপেক্ষায় নীচে বসিয়ে রেখেছি।"

তীব্র বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বারীন বলল, "বাঃ! চমৎকার করেছেন! একটা ভদ্রলোককে নীচে বসিয়ে রেখে, এখন আধঘণ্টা পরে আমার অনুমতি চাইছেন! চমৎকার লোক, আপনি!

কোথায় বসিয়ে রেখেছেন? ডাকুন, ডাকুন তাঁকে। ওরে জিতু, নীচে কে বসে আছেন, তাঁকে নিয়ে আয় তো!"

প্রায় দু' মিনিট পরেই ভৃত্য জিতুর সঙ্গে একজন লোক ড্রয়িংরুমে এসে প্রবেশ করলেন। লোকটি প্রায় ছ' ফুট লম্বা এবং অত্যন্ত কৃশ।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেই বারীনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনিই বোধহয় মিঃ বারীন চাটার্জ্জি?"

বারীন বলল, "হ্যাঁ। আর আপনি?"

বারীনের কথা শেষ হবার সাথে-সাথেই ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম আশুতোষ রায়। আমি একজন আইন-ব্যবসায়ী। আমার একজন সম্ভ্রান্ত মৃত-মক্কেলের অদ্ভুত অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যেই আমার এখানে আগমন।"

তিনি একমুহূর্ত্ত থেমে বললেন, "আমার মৃত-মক্কেল নিহত হবার কিছুদিন আগে আমার কাছে একখানা সীল-করা চিঠি দিয়ে গেছেন। তিনি সেই চিঠিটা দিয়ে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর যদি হঠাৎ কোনো রকম অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে; তবে এই চিঠিটা যেন আমি আপনার কাছে পৌঁছে দিই।"

ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে একখানা সীল-করা খাম বের করে বারীনের হাতে দিলেন। বারীন সেটা কয়েকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, "আপনি ব্যাপারটা আর-একটু পরিষ্কার-ভাবে বলুন মিঃ রায়। আপনার মক্কেল কে? এবং কেন

তিনি আমার কাছে এই চিঠিখানা দিতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন? আপনার কথা থেকে এটুকু বুঝতে পারছি যে, আপনার মক্কেল—তাঁর অদৃষ্টে যে একটা অপমৃত্যু ঘটতে পারে তা কোনো কারণে অনুমান করতে পেরেছিলেন।"

আশুতোষ রায় শুষ্কস্বরে বললেন, "হ্যাঁ। তাঁর অদৃষ্টে কি ঘটবে তা হয়তো তিনি আগেই কোনোক্রমে টের পেয়েছিলেন। প্রায় দিন-তিনেক আগে হঠাৎ তিনি আমার কাছে এসে হাজির হন এবং আমার কাছে একান্ত গোপনে এই চিঠিখানা দিয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুরোধ করেন। তাঁর কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে, তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বললেন যে, কোনো কারণে তাঁর জীবন-হানি ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। একথাও আমাকে তিনি জানান যে এটা তাঁর আশঙ্কা মাত্র। এবং এক সপ্তাহ পরেও যদি তিনি জীবিত থাকেন তবে চিঠিখানা তিনি আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে।"

বারীন জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর এই আশঙ্কার কোনো কারণ আপনি জানেন?"

আশুতোষবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "না। সেকথা তিনি আমাকে বলেন নি।"

বারীন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার মক্কেলের নাম কি?"

আশুতোষবাবু বললেন, "রায়বাহাদুর হরলাল চৌধুরী।

তিনি সরকারী-দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। অধুনা কিছুদিন যাবৎ তিনি তাঁর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। তারপর হঠাৎ কাল রাত্রে—"

বাধা দিয়ে বারীন জিজ্ঞাসা করল, "কাল রাত্রে কোন্ সময় তিনি নিহত হয়েছিলেন ?"

আশুতোষবাবু বললেন, "রাত প্রায় ১০টার সময়। তিনি কোন্ একটা পার্টি থেকে বাড়ী ফিরে আসছিলেন। তারপর বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছবার পর হঠাৎ তাঁর একটা আর্ত্তনাদ শোনা যায়। বাড়ীর লোকজন তখুনি সেখানে ছুটে গিয়ে দেখে, তিনি অতি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর কণ্ঠনলী ছিন্নভিন্ন, তাতে যেন কয়েকটা ফুটো হয়ে গেছে! আর তাঁর ঘাড়ের পাশে একটা সাঁড়াশির দাগ !

তাঁকে সেখান থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানেই প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে তাঁর মৃত্যু হয়।"

বারীন জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর মনের কোনো সন্দেহ তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন ?"

আশুতোষবাবু বললেন, "না। সে সুযোগ তিনি পান নি। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।"

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন্ বেজে উঠল। বারীন এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলতেই ওদিক থেকে প্রশ্ন হ'ল, "কে ? ডিটেকটিভ্ বারীন চাটার্জ্জি ?"

বারীন উত্তর দিল, "হাঁ। বলুন আপনার কি প্রয়োজন?"

উত্তর হ'ল, "প্রয়োজন? প্রয়োজনটা আমার নয়, প্রয়োজন হচ্ছে আপনার। আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন! বন্ধুকে এবার বাঁচিয়েছেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারবেন না। আপনার অমূল্য জীবনটিও যাবে। কাজেই, যদি ভাল চান, তাহলে এখনো খুনের তদন্ত থেকে সরে পড়ুন।

মৃত্যু-সাঁড়াশি আপনাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না।"

কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই টেলিফোন সে ছেড়ে দিল, কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল।

ছয়

কয়েকদিন পরের কথা।

সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে সুজিত বাড়ী এসে কোথাও বারীনকে দেখতে না পেয়ে সোজা তার ল্যাবরেটরীতে এসে হাজির হল। সে দেখতে পেল যে, বারীন একটা টেবিলের সামনে গভীর চিন্তামগ্ন ভাবে বসে রয়েছে। তার সামনেই টেবিলটার ওপর একটা কাগজ এবং বড় খাম। সেখানা দেখেই সে চিনতে পারল যে, ঐ খামখানাই আশুতোষবাবু সীলমোহর অবস্থায় বারীনের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সুজিত একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "ব্যাপারখানা কি? ঐ চিঠিখানা সামনে নিয়ে তুমি গভীরভাবে কিসের ধ্যান করছ বারীন?"

বারীন চিঠিখানার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "এই চিঠিখানা আমাকে আশুতোষবাবু সীল-করা খামে ভরে দিয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিখানা পড়ে দেখ।"

সুজিত চিঠিখানা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল। সে দেখলো, চিঠিতে লেখা আছে:

"অত্যাচারী ধনিক যারা, আমি তাদের যম;
ফুরিয়ে এলো রায়বাহাদুর, তোমার বুকের দম!

আট খুনেতে হাত রাঙাবো, তুমি দুইয়ের পালা,
তোমার বুকের রক্ত-ধারায় মিট্‌বে আমার জ্বালা !"

চিঠিখানা পড়েই সে হেসে ফেলল।

বারীন জিজ্ঞাসা করল, "হাসলে কেন সুজিত ?"

—"হাসবো না ? খুনী দেখ্‌ছি কাব্য-বিশারদ ! মস্ত বড় কবি সে !"

বারীন বলল, "এই চিঠিখানা দেখে তোমার আর কি ধারণা হচ্ছে সুজিত ?"

—"এ থেকে বুঝতে পারা যায়, খুনী যে, সে একজন শ্রমিক বা গরীব-শ্রেণীর লোক, আর সে চায় সাম্যবাদ—অর্থাৎ ধনীদের উচ্ছেদ।"

—"আর কিছু ?"

—"আরো বুঝতে পারছি লোকটি নোংরা, চিঠির এখানে-সেখানে তার হাতের কালী ও ময়লা লেগে রয়েছে।"

বারীন বলল, "কিন্তু কাগজখানি দামী-পুরু কাগজ।"

—"হাঁ।"

—"আর কাগজখানির ওপরদিকের খানিকটা অংশ কেটে ফেলা হয়েছে।"

—"হাঁ।"

—"তার মানে এই হতে পারে যে, ওপরের অংশে কারো নাম-ঠিকানা ছাপানো ছিল, সেটুকু কেটে ফেলা হয়েছে।"

—"হাঁ।"

ঈষৎ হেসে বারীন বলল, "তাহলে তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, এই চিঠির লেখক কখনো গরীব নয়, বেশ রুচি-সম্পন্ন অবস্থাপন্ন লোক; সে নীলাভ পুরু কাগজে নাম ছাপিয়ে রাখে, এবং নাম-ঠিকানা গোপন করবার জন্যেই ওপরের দিকটা কেটে ফেলেছে।

কাজেই তুমি যে ধারণা করেছিলে, চিঠিখানি কোনো গরীব-শ্রেণীর লোকের লেখা, সে ধারণা ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়।

এখন আরেকটা দিকও ভাবা যেতে পারে সুজিত!

লেখক যদি সত্যিই গরীব-শ্রেণীর লোক হয়, তাহলে এই কাগজখানি কখনো তার নিজের সম্পত্তি নয়,—সে তা জোগাড় করেছে অন্য কারো কাছ থেকে।"

সুজিত নীরব হয়ে রইলো, বিস্ময়ে তার কথা বেরুলো না।

বারীন বলল, "এই হলো আমাদের চাক্ষুষ-দৃষ্টির গবেষণা। কিন্তু এ ছাড়া, যন্ত্র-সাহায্যে গবেষণা করে আমি আর-একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি। সেটা আর কিছুই নয়, কতকগুলো আঙুলের সুস্পষ্ট ছাপ।"

আমি এখন আশা করছি যে, এই আঙুলের চিহ্নগুলোর সাহায্যেই আমি এই চিঠিখানার আসল রহস্য উদ্ধার করতে পারব।"

সুজিত সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে বারীনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন

করল, "তোমার কথাগুলো আমার ঠিক বোধগম্য হল না। এই চিঠিখানাতে তুমি কার আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করেছ? এবং তার সাহায্যে এই চিঠির লেখকের আসল রহস্যই বা সমাধান করবে কি উপায়ে?"

বারীন বলল, "আমার কথা শুনে আঁৎকে উঠ না। এই কাগজে যে আঙুলের ছাপগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো আর কারও নয়—স্বয়ং আশুতোষ রায়ের। সীল-করা খামখানার ওপর আশুতোষবাবুর আঙুলের ছাপ ছিল। সেই ছাপের সাথে ভেতরের এই কাগজের অঙ্গুলি-চিহ্নের কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু সীল-করা খামের ভেতরে একখানি চিঠির কাগজে আশুতোষবাবুর অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কার করে আমি একটু চিন্তিত হয়েছি একথা স্বীকার করতে বাধ্য।

আশুতোষবাবু আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত-মক্কেল হরলালবাবু সেই সীল-করা খামখানা তাঁর হাতে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যে, শত্রুর আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হলে সেখানা যেন আমাদের হস্তগত হয়। সুতরাং এটা সত্যি যে, সেই সীল-করা খামের ভেতরে চিঠিতে কি লেখা রয়েছে তা আশুতোষবাবুও জানতেন না। কারণ, চিঠিখানা পড়তে হলে তার সীলমোহর আগে ভাঙতে হবে। অথচ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, সীলমোহর থাকা সত্ত্বেও ভেতরের কাগজখানার ওপর আশুতোষবাবুর আঙুলের চিহ্ন রয়েছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি সেই কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন।

এখন আমার প্রশ্ন এই যে, চিঠিখানা সীলমোহর থাকা সত্ত্বেও সেখানাতে আশুতোষবাবুর আঙুলের চিহ্ন এল কি করে ?”

সুজিত বলল, “অদ্ভুত ব্যাপার বটে ! তাহলে কি তোমার মনে হয় যে, আশুতোষবাবু নিজেই সেই খুনী ? অথবা গোপনে সেই চিঠির সীলমোহর ভেঙে তাঁর মক্কেলের বিশ্বাসের অপব্যবহার করেছিলেন ?”

বারীন বলল, “হ্যাঁ। এ দুটো ছাড়া এর আর কোনো মীমাংসা হতে পারে না। কিন্তু এখন ভেবে দেখতে হবে এ দুটোর মাঝে কোন্‌টা তাঁর পক্ষে সম্ভব। আশুবাবু খুনী বা খুনীদের সংশ্লিষ্ট, একথা আমি ভাবতেই পারি না। বিশেষতঃ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, নিহত জজ রমেশ দত্ত আর আশু-বাবুর মাঝে একটা আত্মীয়তা রয়েছে। দু'জনের মাঝে প্রীতির সম্পর্কও ছিল। অথচ এই রায়বাহাদুরের খুনী আর রমেশ দত্তের খুনী,—একই লোক। কাজেই, আশুবাবু আর যাই হোন, খুনী নন, খুনী হতে পারেন না।

তাহলে আর একটা মাত্র সন্দেহ হ'তে পারে। সে হচ্ছে, আশুবাবু তাঁর মক্কেল রায়বাহাদুরের বিশ্বাসের অপব্যবহার করেছেন ; অর্থাৎ তিনি আসল চিঠিখানা সরিয়ে ফেলে নকল একটা ঠিকানা ভেতরে পূরে দিয়েছেন।

এইরকম সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হয়েছিল বলেই আমি খামখানার ওপর আশুতোষবাবুর আঙুলের ছাপের সাথে চিঠির ভেতরের ছাপগুলো মিলিয়ে দেখেছিলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সাদা-চিঠির সাথে আশুতোষ-বাবুর কোনো চাতুরীর সম্বন্ধ আছে। তাঁর মক্কেলের কথায় আশুতোষবাবু চিঠিখানার সম্বন্ধে একটা অপরিসীম কৌতূহল মনে মনে পোষণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে সীল ভেঙে আসল চিঠিখানা হস্তগত করেন। তারপর আবার আগের মত একটা নকল চিঠি খামের ভেতরে ভরে সীলমোহর করে রাখেন। কারণ, তিনি জানতেন যে তাঁর মক্কেল মৃত—সুতরাং তাঁর এই কীর্ত্তি কেউই জানতে পারবে না। আমরা এই চিঠিখানাকেই তাঁর মক্কেলের সীল-করা চিঠিখানা মনে করব।

আমার বিশ্বাস, আসল চিঠিখানাতে এমন কোনো সংবাদ দেওয়া ছিল যাতে আশুতোষবাবুর কোনো স্বার্থের সম্বন্ধ রয়েছে। এবং তার ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতা।

আমি চিন্তা করছি, হরলালবাবু তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন্ সংবাদ আমাদের এইভাবে জানাতে চেস্টা করেছিলেন।"

সুজিত কিছু বলতে যাবে এমন সময়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন শশাঙ্কবাবু। তিনি বারীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর-একটা নূতন সংবাদ শুনবার জন্যে তৈরি হও বারীন! হরলাল চৌধুরীর তরফ থেকে তাঁর হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্যে কুড়ি হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর এটর্ণির সাথে দেখা করে

তাঁর উইলে একটা নূতন সর্ত্ত যোগ করেন। সেই সর্ত্তটা এই যে, তাঁর হঠাৎ কোনরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তাঁর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। এবং যে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবে তাঁকে উপরি-উক্ত অর্থ পুরস্কৃত করা হবে।"

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

বারীন রিসিভার তুলে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে নিলে; তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "আপনাদের কমিশনার-সাহেব ফোন করছিলেন।"

—"কমিশনার সাহেব ?"

—"হাঁ। তিনি যা বললেন, তার মর্ম্ম হচ্ছেঃ এইমাত্র তিনি 'ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া' থেকে একখানি চিঠি পেয়েছেন। তারা জানিয়েছে, রায়বাহাদুর বেঁচে থাকতেই ঐ ব্যাঙ্কে কুড়ি হাজার টাকা জমা রেখে তাদের অনুরোধ করে গেছেন যে, যদি কোনো কারণে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়,—অর্থাৎ কোনো শত্রুর চক্রান্তে যদি তিনি প্রাণ হারান, তাহলে সেই শত্রুকে যিনি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবেন এই টাকা হবে তাঁর পুরস্কার। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে রায়বাহাদুর অনুরোধ করে গেছেন, সেরকম ক্ষেত্রে তিনি যেন এই গচ্ছিত টাকার কথা পুলিশ-কমিশনারকে জানিয়ে দেন। রায়বাহাদুর তাঁর উইলেও নাকি এরকম একটা সর্ত্ত রেখে গেছেন।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তাহ'লে বারীন, কমিশনার-সাহেব

তোমাকে এ-খবর জানিয়ে বোধহয় একটু চাঙ্গা করে তুলতে চান।”

—“শুধু আমাকে নয়, আপনাকেও। তিনি আপনাকেও নিশ্চয়ই একথা বলবেন।”

—“বেশ, তাহলে এখন কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লাগো বারীন!”

দেখা গেল, বারীন নির্ব্বিকার। সে যেন আর ইহজগতে নেই। গভীর অন্যমনস্কভাবে—উদাস চোখে—দূরে সে আকাশের কোণে কিসের গোপন লেখা পড়ছিল তন্ময় হয়ে!

শশাঙ্কবাবু মৃদু হেসে তার দেহে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, “বারীন! কি হ'ল তোমার? হঠাৎ এমন একটা সমাধি-ভাব!”

সদ্য ঘুম-ভাঙা মানুষের মত বারীন হঠাৎ চমকে উঠে বলল, “হাঁ, আজ একটা সত্য আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠেছে ইন্‌স্পেক্টরবাবু!”

—“কি সেই সত্যটা, শুনি?”

বারীন বলল, “আমি বুঝতে পেরেছি আশুতোষবাবু আমাকে যে চিঠিখানা দিয়েছেন, এখানা রায়বাহাদুরের চিঠি নয়।

রায়বাহাদুরের এটর্ণি-আফিস আর ব্যাঙ্কের মারফৎ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্যে যে বিশ-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণার কথা আমরা এইমাত্র জানতে পেরেছি, সেইরকম কোনো ঘোষণা রায়বাহাদুরের চিঠির ভেতরেও ছিল। মৃত্যুর

পূর্ব্বে তিনি এমনি বন্দোবস্ত করে গেছেন যে, খুনীকে গ্রেপ্তারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণার কথা তাঁর এটর্ণি, তাঁর ডিটেক্‌টিভ্‌, তাঁর ব্যাঙ্ক ও পুলিশ, সবাই যেন জানতে পারে। কিন্তু আশুতোষবাবু ভেবেছিলেন, পুরস্কারের কথা বোধহয় কেবল এই চিঠির ভেতরেই ছিল! তাই তিনি চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলে, সম্ভবতঃ নিজেই খুনীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছেন, ঐ বিশহাজার টাকা পুরস্কারের লোভে। আর আমাকে যে চিঠিখানা দেওয়া হয়েছে, সম্ভবতঃ সেটি তাঁর নিজের রচনা—আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে চালিয়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু আশুতোষবাবু জানতেন না যে, পাছে তিনি হরলালবাবুর চিঠিখানা বেমালুম চেপে যান, এই আশঙ্কায় হরলালবাবু তাঁর ব্যাঙ্ককেও উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন। কাজেই, আশুতোষবাবুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু এখনো একটা কথা,—একটা বড় কথা আমরা জানতে পারিনি ইন্‌স্পেক্টরবাবু! আমরা জানতে পারিনি, কে এই খুনী; কি তার উদ্দেশ্য; কোন্ কোন্ আটজন লোক তার অভীষ্ট বলি আর কি তাদের অপরাধ!

অথচ এটুকু না জানলে আমরা কিছুই করতে পারি না। কাজেই, সেজন্যে দু'এক জায়গায় খানাতল্লাস করতে হবে। প্রথমে করতে হবে রায়বাহাদুরের বাড়ী, পরে দরকার হ'লে আশুতোষবাবুর বাড়ী।

আপনি তৈরি থাকবেন শশাঙ্কবাবু, আমি আজই কিছু কাজ এগিয়ে রাখতে চাই।”

সাত

সমস্ত দিন বারীনের আর দেখা পাওয়া গেল না। বারীনের মনের ভাব না বুঝতে পারলেও সুজিত এটুকু টের পেয়েছিল যে, বারীনের মনে কোনো একটা মতলব উপস্থিত হয়েছে—এবং সে গোপনেই তার কাজ করে যাচ্ছে। বারীনের এই লুকোচুরিতে সুজিত একটু অসন্তুষ্ট হলেও সে বারীনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করল না।

সন্ধ্যার পর বারীন ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই দেখতে পেল, সুজিত একটা সোফাতে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেদিনকার খবরের কাগজখানা পড়ছে। বারীনকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুজিত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

বারীনকে খুব ক্লান্ত দেখালেও সে সুজিতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "প্রচ্ছন্ন আততায়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে সুজিত! আমাদের খানাতল্লাস সার্থক হয়েছে।"

সুজিত বিস্মিতভাবে সোফা থেকে উঠে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কার সন্ধান পেয়েছ বললে? প্রচ্ছন্ন আততায়ীর? তুমি আমার সাথে উপহাস করছ বোধহয়?"

বারীন হেসে বলল, "না। তোমার সাথে উপহাস করে আমি একথা বলিনি। যে লোক এই দুটো নরহত্যা করেছে তার প্রকৃত পরিচয় আমি আজ জানতে পেরেছি। তবে তার

পরিচয় জানতে পারা আর তাকে আবিষ্কার করে গ্রেপ্তার করার ভেতরে অনেক পার্থক্য আছে। সব-কিছু ঘটনাই তোমাকে খুলে বলছি।”

বারীন তার পকেট থেকে একখানা ছোট ডায়েরী বই বের করে বলল, “এটার সাহায্যেই আমি এই সত্য আবিষ্কার করেছি। এই ডায়েরীটা—নিহত হরলাল চৌধুরীর। তাঁর ঘর থেকে এটা আবিষ্কার করা হয়েছে।”

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, “তুমি তাহলে হরলালবাবুর বাড়ীতে হানা দিয়েছিলে?”

বারীন বলল, “হাঁ। শুধু আমি নয়। শশাঙ্কবাবুও সঙ্গী হয়েছিলেন। এবং সেখানে আমাদের হানা দেওয়া যে বৃথা হয়নি তার প্রমাণ এই নোট বই।”

সুজিত সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করল, “কিন্তু তুমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে কেন, শুনি?”

বারীন বলল, “কারণ বিশেষ কিছুই ছিল না। তুমি জান যে, হরলালবাবু দু'খানা ভীতি-প্রদর্শক উড়ো-চিঠি পেয়েছিলেন বলে আশুতোষবাবু আমাদের বলেছিলেন। কিন্তু সেই চিঠিতে কি লেখা ছিল তা জানা বা সেটা দেখবার সৌভাগ্য কারো হয়নি। এর আগে নিহত বিচারক রমেশ দত্ত নিহত হবার পরও আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, তিনিও ঐরকম ভীতি-প্রদর্শক উড়ো-চিঠি পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই চিঠির মর্ম্মও তিনি কাউকে জানান নি। সুতরাং এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে

"তাহলে তুমি বলবে না সেই চিঠি কোথায় রেখেছ ?"

পৃষ্ঠা—৭৫

যে, তাদের এই গোপনতার কারণ কি? পুলিশে পর্য্যন্ত তাঁরা খবর দিলেন না কেন?

আমি অনেক ভেবেও কিছু ঠিক করতে না পেরে ভাবলাম যে, নিহত হরলাল চৌধুরীর ঘরে হয়ত এমন কোনো বস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা আমরা অগ্রসর হবার একটা পথ পাব। তাই আমি শশাঙ্কবাবুকে সাথে নিয়ে হরলালবাবুর বাড়ী খানাতল্লাস করতে যাই।

সেখানে চারিদিক তন্নতন্ন করে সন্ধান করেও আমরা তাঁর নিহত হবার কোনো সূত্র না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ তাঁর বিছানার নীচে এই ডায়েরীটা দেখতে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে এটা তুলে নিলাম।

ডায়েরীটা এমন গোপন স্থানে রাখবার কারণ খুঁজে পেলাম না। আমার আশা হল যে, এটার ভেতরে হয়ত আমরা কোনো সন্ধান পেতে পারি। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে আমার সে আশা ব্যর্থ হয়নি।

ডায়েরীটা স্বয়ং হরলালবাবুর। সেটার ভেতরে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথাই লেখা ছিল। সেটা পড়তে পড়তে এক জায়গায় চোখ পড়তেই আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। সামান্য কয়েকটা লাইন—কিন্তু এতেই সমস্ত কিছু স্পষ্ট আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। শুধু তাই নয়, সেই ডায়েরীর ভেতর থেকে বের হল একটা চিঠি—প্রচ্ছন্ন আততায়ীর সেই ভীতি-প্রদর্শক চিঠি-দুটোর একটা।”

বারীন পকেট থেকে অতি সাবধানে একটা ছোট ভাজ-করা চিঠি সুজিতের হাতে দিল। সুজিত ব্যগ্রভাবে সেটা খুলেই দেখতে পেল—তাতে লেখা রয়েছে ঃ

"তোমার বিচারের দিন সমাগত। প্রাণ দিয়ে তোমাকে অতীতের একটা মারাত্মক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত থেকো। আমার এই হুমকি যে বৃথা ভীতি-প্রদর্শন নয়, তার প্রমাণ বিচারক রমেশ দত্তের মৃত্যু। এরপর একে-একে তোমাদের সাতজন জুরীকে আমি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমার দণ্ড অমোঘ। তার বিরুদ্ধে কোন আপীল নেই।

ইতি—

অরুণ ব্যানার্জ্জি"

সুজিত গভীরভাবে তিন চারবার চিঠিটা পড়ে গেল। তারপর বারীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই চিঠির অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিক বোধগম্য হল না। কিসের ভুলের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে? এবং একটা ভুলের জন্যে এমন নিষ্ঠুর-ভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবারই বা মানে কি?"

বারীন বলল, "সব বলছি। এই ডায়েরীখানা একবার পড়ে দেখ তার আগে।"

বারীন ডায়েরীটার একটা পাতা খুলে সুজিতের দিকে এগিয়ে দিল। সুজিত দেখতে পেল তাতে লেখা রয়েছে ঃ

"কে জানত যে অতীতের ভ্রম আজ এমন মারাত্মকভাবে

আত্মপ্রকাশ করবে? বেশ বুঝতে পারছি যে আমাদের একের পর একের মৃত্যু অবধারিত।

রমেশ দত্ত নিহত হয়েছে, এবার আমার পালা। শয়তান আমার পিছু নিয়েছে।

কিন্তু মৃত্যুর জন্যে আমি ভীত নই।

মৃত্যুর আগে শয়তানের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে যাব যাতে সে এই মারাত্মক খেলা আর খেলতে না পারে।

আমার মৃত্যু হলেও, আমার সাথে-সাথেই যেন শয়তানের খেলা বন্ধ হয়ে যায় আমি সে ব্যবস্থা করে যাব।

অরুণ ব্যানার্জ্জি! হয়ত সেদিন তুমি নির্দ্দোষ ছিলে, আমরা তা বুঝতে পারিনি। সেদিন তোমার সাজা হয়েছিল অন্যায়ভাবে। কিন্তু এখন আর তুমি নিরপরাধ নও। বিচারক রমেশ দত্তের রক্তে তোমার হাত রাঙিয়েছ, হয়ত আমাকেও তুমি শেষ করবে। কাজেই, তোমার মত নির্ম্মম প্রতিহিংসা-পরায়ণ শয়তানের গ্রেপ্তারের জন্যে আমার বিশহাজার টাকার মমতা আমাকে ছাড়তে হবেই। আমি তার বন্দোবস্ত করে যাব শয়তান!"

সুজিত ডায়েরীখানা বারীনের হাতে ফিরিয়ে দিলে। বারীন জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বুঝতে পারলে?"

সুজিত বলল, "হাঁ। এই খাপছাড়া রহস্যের এখন যেন কিছু-কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।"

বারীন তার পকেট থেকে একটা পুরু খাম বের করে বলল,

"এখন আরেকটা জিনিষ দেখ। এটা হচ্ছে, বছর-তিনেক আগেকার একখানা পুলিশ রেকর্ড। এখানা শশাঙ্কবাবুর সাহায্যে আমি অনেক কষ্টে জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছি।"

বারীন একটু থেমে বলতে সুরু করল, "প্রায় বছর-তিনেক আগে একটা নরহত্যা-মামলার বিচারভার প্রদত্ত হয়েছিল বিচারক রমেশ দত্তের ওপর। সেই বিচারে সাতজন জুরী নির্ব্বাচিত হয়েছিল। আসামীর নাম ছিল অরুণ ব্যানার্জ্জি।

বিচারক এবং জুরীদের বিচারে আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। বয়সের কথা বিবেচনা করে জজ তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করে দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

এর প্রায় একবৎসর পরে প্রকাশ পেল যে, যে-অপরাধে অরুণ ব্যানার্জ্জির দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল তা মিথ্যা। আসল অপরাধী সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি। পুলিশের চেষ্টায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এই কথা আবিষ্কার হওয়ামাত্র দ্বীপান্তরিত অরুণ ব্যানার্জ্জির মুক্তির আদেশ প্রদত্ত হয়। কিন্তু সেই আদেশ পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ, তার ঠিক একদিন আগে অরুণ ব্যানার্জ্জি অন্য একজন কয়েদীর সাথে দ্বীপান্তর থেকে পলায়ন করে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। তার সন্ধান নিতে পুলিশ চেষ্টার কোনো ক্রুটী করেনি। কিন্তু সব বৃথা। তাকে বা তার সঙ্গীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে নি।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে বারীন আবার বলল, "অরুণ ব্যানার্জ্জি তার প্রতি অবিচারের কথা বিস্মৃত হয়নি। তাই

সে তার বিচারকারীদের ধ্বংস করবার জন্যে এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছে।

এখন বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে, একটা অবিচারের ফলে একজন শান্ত এবং ভদ্রবংশের যুবক কিরূপ সাংঘাতিক নরঘাতকে পরিণত হয়েছে ?"

সুজিত বলল, "কি অদ্ভুত পরিণতি ! প্রতিহিংসা গ্রহণের এই অদ্ভুত কৌশল যার মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে যে খুব সহজ চিজ্ তা আমার মনে হয় না।"

বারীন বলল, "তাই বটে ! এই প্রচ্ছন্ন-আততায়ীর পরিচয় এবং তার প্রতিহিংসা গ্রহণের মূল কারণ আমরা জানতে পারলেও, সহজে যে তাকে আমরা হাতে পাব সে বিশ্বাস আমার নেই। তার বিরুদ্ধে অতি সাবধানে এবং কৌশলে আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে। নইলে একদিন হয়ত তার হাতে আমাদেরই লাঞ্ছনা সইতে হবে। একবার যদি সে আমাদের হাতে পায়, তাহলে তার ফলে যে কি ঘটবে, তা বুঝতে পারছ ত ?"

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে কোন্ সূত্র অবলম্বন করে ?"

বারীন অন্যমনস্কভাবে বলল, "সে ব্যবস্থা আমি অনেক চিন্তা করে স্থির করেছি। অরুণ ব্যানার্জ্জির পরবর্ত্তী শিকারই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন। তাদের সাহায্যেই আমরা এই রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করব। ভুলে যেওনা যে এখনও

তার জ্বলজ্যান্ত ছয়জন শত্রু বর্ত্তমান। আমি সেই ছয়জনের নাম-ঠিকানা জেনে নিয়েছি। এ-কথা ধ্রুব সত্য যে, এবার নিশাচর হাউণ্ডের লক্ষ্য হবে এই ছয়জনের ভেতরে একজন। কাজেই, আমি তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের সবাইকে চোখে-চোখে রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আর এই উপায়েই আমি একদিন অরুণ ব্যানার্জ্জিকেও খুঁজে বার করে নেবো।”

আট

আশুতোষবাবুর বিশাল প্রাসাদের এক অন্ধকার ঘরে দুটি লোক অতি মৃদুস্বরে আলাপ করছিল। তাদের একজন আশুবাবু স্বয়ং, অপর জন তাঁর কর্ম্মচারী জহর।

জহর তাঁর পুরানো কর্ম্মচারী যতীনবাবুর ছেলে। যতীনবাবু প্রায় দশ-বারো বছর আশুবাবুর কাছে কাজ করে অবশেষে হঠাৎ একদিন কলেরায় প্রাণত্যাগ করেছেন। তারপর বছর-দুয়েক তাঁর ছেলেপিলে বা অন্য কারো কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। হঠাৎ একদিন এক প্রাচীন মহিলার হাত ধরে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের এক যুবক আশুবাবুর সুমুখে এসে দাঁড়াল।

যুবকের নাম জহর—যতীনবাবুর একমাত্র পুত্র, আর বৃদ্ধা মহিলা তার মা—যতীনবাবুর বিধবা স্ত্রী। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যুবকের কোনো কাজের জন্যে বৃদ্ধা আশুবাবুকে অনুরোধ করল।

জহর সেই থেকে আশুবাবুর কাজ করছে। লেখাপড়া কম জানলেও সে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী আর খুব বিশ্বাসী। আশুবাবু অনেক গোপন কাজেও তার সাহায্য নিয়ে থাকেন, সেও প্রাণ দিয়ে তা সমাধা করে আসে। আজও তেমনি কোনো গোপন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

জহর বলল, "কাকাবাবু, আপনার উপদেশমত আমি ঐ ছটি লোকের বাড়ীতেই পাহারা বসিয়েছি। যে-কেউ ও-বাড়ীতে ঢুকছে, তাদের কেউই আমার লোকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, আজকে আক্রমণ হবে শেখর বোসের ওপর।"

—"কেমন করে বুঝলে ?"

—"কারণ, কাল থেকে দুটি লোক শেখর বোস ও তাঁর বাড়ীর ওপর কড়া নজর রাখছে। তাদের একটা লোক কুলীর সাজে আজ বিকেল থেকে সেখানে বসে রয়েছে। সন্ধ্যার খানিক পরে ভদ্রবেশী একজন লোক কুলীটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'খবর কি ?' সে উত্তর দিলে, 'ভেতরেই আছে।' ভদ্রবেশী লোকটা বললে. 'আর দু'এক ঘণ্টা সাবধানে থাক্। আমি আসছি খানিক পরেই।"

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কথাবার্ত্তা হয়েছে কতক্ষণ আগে ?"

জহর বলল, "বোধহয় ঘণ্টা-দুই আগে।"

আশুবাবু বললেন, "তাহলে আর দেরী নয় জহর। আমি এখুনি বেরুবো, তুমি বাড়ীতে সাবধানে থেকো। মনে রেখো, তোমার ও আমার মত লোকের পক্ষে বিশহাজার টাকা পুরস্কার খুব সামান্য কিছু নয়। পুলিশ ও গোয়েন্দার দল যে-সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, দেখো, আমি তার সমাধান করি কত সহজে !"

এই বলে একটু পরেই তিনি কিছু স্থির করে ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে এসে হাজির হলেন। তারপর দ্রুত-পদে তাঁর গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

পথের কিছু দূরে একজন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত ভবঘুরে-গোছের লোক অনেকক্ষণ থেকে আশুতোষবাবুর বাড়ীর কিছু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল আশুতোষ-বাবুর বাড়ীর দিকে। আশুতোষবাবুকে বাড়ী থেকে ব্যস্ত-ভাবে বাইরে বেরোতে দেখে সে সরে একটু আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়াল। আশুতোষবাবু তার এই গোপন-অবস্থিতির সংবাদ জানতে পারলেন না। তিনি কিছু চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্কভাবে অগ্রসর হলেন। তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে সেই ভবঘুরে লোকটি দূর থেকে অতি সন্তর্পণে তাঁর অনুসরণ করে চলল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে আশুতোষবাবু একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আশুতোষবাবু সেই বাড়ীর ভেতরে অদৃশ্য হবার দুমিনিট পরে সেই ভবঘুরে-গোছের লোকটি ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল, প্রবেশ-দ্বারের ডান-দিকে একটা পিতলের 'নেম-প্লেট' বসান রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে :

S. K. BOSE.
Banker

'নেম্-প্লেট'টার দিকে তাকিয়ে ভবঘুরে লোকটি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—আশুতোষবাবু তাঁর বাড়ী থেকে এত ব্যস্তভাবে এখানে এসে উপস্থিত হলেন কেন? এস্, কে, বোস লোকটা কে? এবং এর সাথে আশুতোষবাবুর কি সম্বন্ধ সন্ধান নিতে হবে। কিন্তু বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করা ছাড়া সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না। আগে বারীনকে ফোন করে এই সংবাদ জানানো দরকার। তারপর অবস্থা বুঝে কাজ করা যাবে।

ছদ্মবেশী সুজিত সেখান থেকে দ্রুতপদে সামনেই একটা দোকান থেকে বারীনকে ফোন করল। সুজিতের সাড়া পেয়ে বারীন বলল, "কি ব্যাপার সুজিত? আমি তোমার কাছ থেকে সংবাদ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো সংবাদ আছে?"

সুজিত বলল, "হ্যাঁ। তুমি আমাকে আশুতোষবাবুর ওপর নজর রাখতে বলেছিলে। আমি এতক্ষণ ছদ্মবেশে সেখানেই ছিলুম। এইমাত্র তাঁকে ব্যস্তভাবে পথে বেরোতে দেখে আমি তাঁর অনুসরণ করি। তিনি প্রায় পনেরো মিনিট পরে সুইনহো ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর চারিদিকে একবার তাকিয়ে সেই বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলেন। বাড়ীটার সামনে দরজায় একটা পেতলের 'নেম্-প্লেট' বসানো রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে এস্, কে, বোস, ব্যাঙ্কার।"

সুজিতের কথা শুনে বারীন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "এস্, কে, বোস, ব্যাঙ্কার! তুমি ভুল কর নি ত?"

সুজিত বলল, "না। ভুল হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তুমি কি এই এস্-কে-বোসকে চেন নাকি? তুমি এই নাম শুনে খুব বিস্মিত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে যেন!"

বারীন একটু থেমে বলল, "আমার কথা শুনলে তুমিও আশ্চর্য্য হবে সুজিত। কারণ, এই এস্-কে-বোসের পুরো নাম শেখরকান্তি বোস। লোকটা অসম্ভব ধনী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। অরুণ ব্যানার্জ্জির বিচারের সময় সেই সাতজন নির্ব্বাচিত-জুরীদের ভেতরে এই শেখরকান্তি বোস একজন। আমি সেই নির্ব্বাচিত-জুরীদের পরিচয় সংগ্রহ করেছি বলেই এই কথা জানতে পেরেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ, অরুণ ব্যানার্জ্জি যাদের হত্যা করবে বলে স্থির করেছে, এই শেখরবাবু তাদেরই একজন?"

সুজিত আঁৎকে উঠে বলল, "কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু আশুতোষ বাবু এখানে আবির্ভাব হয়েছেন কি উদ্দেশ্যে অনুমান করতে পার?"

বারীন বলল, "না। তবে বিনয় ব্যানার্জ্জির সাথে যে এই সাক্ষাতের সম্বন্ধ আছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"

সুজিত বলল, "তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো বারীন! বাড়ী ফিরে তোমাকে কোনো নূতন সংবাদ দিতে পারব আশা করি। আমার ফিরতে দেরী হতে পারে। কিন্তু সেজন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না।"

সুজিত রিসিভারটা রেখে পথে এসে দাঁড়াল। সে কোন্

কাজে অগ্রসর হচ্ছে তা সে বারীনের কাছে গোপন করে গেল। কারণ, সে জানত যে বারীন তাকে একলা কোনো বিপজ্জনক কাজে অগ্রসর হতে দেবে না।

সুজিত আবার সেই বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে সে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করবার উপায় চিন্তা করতে করতে অস্ফুটস্বরে বলল, "আশুতোষবাবুর এই লুকোচুরীর কারণ আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে। এবং তা করতে হলে আমার এই বাড়ীতে গোপনে প্রবেশ করা দরকার।"

সুজিত প্রবেশ-পথ অনুসন্ধান করতে লাগল।

সে দেখল, জানলার পাশ দিয়ে একটা জলের মোটা পাইপ ওপরে ছাদে উঠেছে। মনে মনে ভাবল, ঐ পাইপটা বেয়ে ওপরে ওঠা কি অসম্ভব বলে মনে হয়? একটু চেষ্টা করলে ঐ পাইপটার সাহায্যে নিশ্চয়ই সে অনায়াসে ঐ জানলার কাছে পৌঁছতে পারবে।

সে পাইপটার নীচে এসে চুপ করে দাঁড়াল।

নয়

জলের পাইপের সাহায্যে পনেরো-মিনিট পরে সুজিত জানলার ধারে এসে পৌঁছল। জানলায় কোনো গরাদে দেওয়া ছিল না। জানলা টপ্‌কে সে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল।

ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

সুজিত তার পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ্চ বের করে জ্বেলে দেখতে পেল, সেটা কারও শোবার ঘর। সেই ঘর পার হয়ে সামনেই একটা চওড়া বারান্দা।

সুজিত নিঃশব্দে সেই বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দার গায়ে সারি-সারি খান-তিন-চার ঘর। সবগুলো ঘরই অন্ধকার। কোনো দিকে আলোর একটু চিহ্নমাত্র নেই।

সুজিত মনে-মনে ভাবল, আশুতোষবাবু গেলেন কোথায়? একমুহূর্ত্ত পরেই তার মনে হলো কারা যেন কথা বলছে।

সুজিত সেই স্বর লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। বারান্দার ডান-দিকেই একটা সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। সে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির নীচেই একটা ঘর। ঘরের ভেতর থেকে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়ছিল। ঘরের ভেতরে কারা যেন অস্ফুট স্বরে আলোচনা করছিল বলে মনে হল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সুজিত কিরকম একটা যেন অসোয়াস্তি বোধ করছিল। তার মনে হল, যেন সে ছাড়া আরও একজন তৃতীয় পক্ষ সেই বাড়ীতে উপস্থিত আছে। কিন্তু সে কে তা সে অনুমান করতে পারল না। সুজিতের মনে হ'ল তার প্রত্যেকটী কাজ যেন সে অতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে।

কিন্তু সেই দারুণ অন্ধকারে চারিদিকে তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না।

তারপর সে অতি সতর্কভাবে সেই সিঁড়ির নীচে ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, কেউ উত্তেজিত স্বরে বলছে, "আমার কথা লঙ্ঘন করলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী শেখরবাবু। এই মুহূর্ত্তে দশ হাজার টাকা দিলে আমি আপনার বাঁচবার উপায় করে দিতে পারি।

অরুণ ব্যানার্জ্জির সাঁড়াশির কবল থেকে আপনি রক্ষা পাবেন না একথা ধ্রুবসত্য। হরলালবাবুর মৃত্যুর পর এবার আপনাদের একজনের পালা এসেছে।"

শেখরবাবু হেসে বললেন, "আপনার এ-আশঙ্কা অমূলক আশুতোষবাবু। অরুণ ব্যানার্জ্জির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি খুব খুশীই হব। কারণ, তার অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থাই আমি তৈরি করে রেখেছি।"

সুজিত বুঝতে পারল যে ঘরের ভেতরে বক্তাদের মধ্যে একজন আশুতোষবাবু এবং আরেকজন শেখর বোস।

সুজিতের হঠাৎ মনে হ'ল, একটা গাঢ় ছায়া যেন সেই ঘরের দরজা ছাড়িয়ে সামনের একটা জানলার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু তাকে এইভাবে বেশীদূর এগোতে হল না। খানিকটা অগ্রসর হতেই অন্ধকারে একটা কিছুর ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

সুজিত স্পষ্ট বুঝল, এতক্ষণ তাহলে সত্যিই আরো কেউ সে বাড়ীতে রয়েছে।

বাইরের সেই শব্দ শুনেই ঘরের ভেতরে আলোচনা বন্ধ হল। সুজিত ও সেই ছায়ামূর্ত্তি বুঝতে পারল যে, তাদের অস্তিত্ব আর অজানা নেই।

সুজিত কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে গেল। সুজিত দেখল, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং আশুতোষবাবু। তাঁর হাতে একটা রিভলভার। পেছনে টর্চ্চ হাতে শেখরবাবু তাঁর পিছু-পিছু বাইরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি আশঙ্কা ও সন্দেহে পূর্ণ।

শেখরবাবু অগ্রসর হয়ে আহ্বান করলেন, "টাইগার? ডিক্?"

শেখরবাবুর এই আহ্বানের সাথে-সাথে প্রকাণ্ড দুটো হাউণ্ড দ্রুতপদে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেখরবাবুর কাতর আর্ত্তনাদে চারদিক

প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। সুজিত স্তম্ভিত হয়ে দেখল, এক সুউচ্চ ছায়ামূর্ত্তি শেখরবাবুর পেছনে দাঁড়ালো—হাতে তার সুদীর্ঘ সাঁড়াশি। সাঁড়াশির নিষ্পেষণে শেখরবাবুর দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

আর্ত্তনাদ শুনে আশুবাবুও ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছায়া-মূর্ত্তির বীভৎস কাণ্ড দেখে তিনিও প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাঁর রিভলভার তুলে ছায়ামূর্ত্তিকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন।

বিপরীত দিক থেকে তখনই আবার একবার গুলির আওয়াজ হলো। পরক্ষণেই সুজিত দেখতে পেল, আশুতোষ-বাবু দ্রুতপদে বারান্দা দিয়ে টলতে টলতে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর হাতের রিভলভার থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আহত আশুতোষ-বাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

বিদ্যুদ্বেগে তৎক্ষণাৎ কোথা হ'তে ছুটে এলো বারীন। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে আশুবাবুর পকেট হাতড়ে সমস্ত কাগজ-পত্র বার করে নিল, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সুজিতকে বলল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে সুজিত! শেখরবাবু বেঁচে নেই, আশুবাবুও গেলেন প্রায়! কে তাঁকে গুলি করেছে। তুমি এইখানেই—আশুবাবুর কাছে থাকো, আমি দেখে আসছি গেল কোথায় সেই খুনী ছায়ামূর্ত্তি।"

বলেই যেমন সে এসেছিল ঠিক্ তেম্‌নি বিদ্যুদ্বেগে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ

সুজিত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে মুমূর্ষু আশুবাবুর কাতরানি দেখছিল অভিভূতের মত। হঠাৎ খানিকটা দূরে কি একটা দেখে সে চমকে উঠল।

সে ভাবল, এ কি সত্যি দেখছি, না চোখের ভুল? সে তার দুই চোখ বেশ করে একবার রগড়ে নিল, তারপর আবার সে সুমুখের দিকে তাকাল।

না,—এ তো ভুল নয়! এ যেন একটা কঠিন সত্য হিংস্র-চেহারায় তার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে!

সুজিত দেখল, আবার সেই সুদীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি, হাতে তার রিভলভার—রিভলভারের লক্ষ্য সে নিজে! মূর্ত্তি তারই দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে মূর্ত্তিমান হিংস্র যমের মত।

সুজিত এক মুহূর্ত্ত শিউরে উঠল, পরক্ষণেই সে তার রিভলভারের অনুসন্ধানে পকেটে হাত দিল।

ছায়ামূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ বজ্রকণ্ঠে আদেশ করল, "যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক সেইভাবেই থাকুন সুজিতবাবু! পকেট থেকে রিভলভার বার করবার আগেই আমার গুলিতে আপনি পরপারে যাত্রা করবেন।"

সুজিত তার পকেট থেকে হাত বার করল অসহায়ভাবে; সাথে-সাথে গুণ্ডা-আকৃতির একটা লোক এসে তার গা ঘেঁসে

দাঁড়াল। তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে সুজিতের পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে, সুজিতকেই লক্ষ্য করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সুজিতের সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। সে নিশ্চল হয়ে ছায়ামূর্ত্তি ও তার সহচরের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। অত অন্ধকারেও সুজিত দেখতে পেল, ছায়ামূর্ত্তির বীভৎস মুখে তখন বিজয় ও দর্পের হাসি ফুটে উঠেছে।

ছায়ামূর্ত্তি শেখরবাবুর মৃতদেহের ওপর দিয়ে একবার মাত্র তার হাত দু'খানি বুলিয়ে নিল, তারপর টর্চ্চের আলো ফেলে তার সারাদেহ বেশ করে একবার দেখে নিল।

সে-আলোয় সুজিতও দেখতে পেল, মৃতদেহের বুকের কাছে আঁটা রয়েছে একখণ্ড কাগজ; আর তাতে লেখা আছে ৮—৩, অর্থাৎ আটটির মাঝে তিনটি শেষ!

ছায়ামূর্ত্তি পরক্ষণেই আশুবাবুর মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি তার জামার সব-ক'টি পকেট হাতড়ে, কিছুই না পেয়ে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত হুঙ্কার দিয়ে সুজিতকে বলল, "রায়বাহাদুর হরলাল চৌধুরীর সীল-করা খামের ভেতরের আসল চিঠিখানা আমি চাই, এবং এখুনি।"

সুজিত তার প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে বলল, "কে তুমি? আর এমন প্রশ্ন করে তুমি কি বলতে চাও, তা আমি বুঝতে পারছিনা।"

—"বটে! বুঝতে পারছ না? ন্যাকামির চেষ্টা করো না গোয়েন্দা! আমিই সেই লোক—সেই অরুণ ব্যানার্জ্জি, যে গুণে গুণে আটটা লোককে খুন করবে বলে তোমাদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমার প্রতিশ্রুত তালিকার তিনটি আজ শেষ হল,—আর শেষ হল বড্ড বেশী কৌতূহলী বলে এই উকীল আশুতোষ রায়। কাজেই, এটা হল আমার 'ফাউ'। আমার পথে দাঁড়িয়ে এইরকম ফাউয়ের সংখ্যা আরো বাড়াবে মাত্র—তোমাদের লাভ হবে না কিছুই। এখনো তাই হিসেব করে, বুদ্ধিমানের মত কাজ করো সুজিত!

আমি ঠিক জানি যে, সেই আসল চিঠিখানা এই আশু-উকীলের পকেটেই ছিল,—সে তাই-ই করে এসেছে চিরদিন। বল সেই চিঠি কোথায়? নইলে শেষ পরিণামের জন্য তৈরি হও।"

সুজিত এতক্ষণে তার কথার মর্ম্ম বুঝতে পারল; একথাও সে বুঝল যে, কাগজখানা তাহ'লে বারীনের হাতে পড়েছে।

সুজিতকে নীরব দেখে ছায়ামূর্ত্তি আর-একবার গর্জ্জন করে উঠল, "কাগজ বার কর শয়তান!"

সুজিত অসহায়ভাবে বলল, "আমাকে বিশ্বাস কর, আমি এর কিছুই জানি না।"

—"বটে! এখনো চালাকি হচ্ছে! তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন এতক্ষণ?"

বলেই সে তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে সহসা তার

মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে সুজিতের চতুর্দ্দিকে যেন একটা অন্ধকার গাঢ় আবরণ নেমে এলো,—আর তৎক্ষণাৎ কোন্ এক হিংস্র অক্টোপাসের লৌহ-কঠোর বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

খানিক পরেই শেখরবাবুর বাড়ীতে যখন [illegible]রীন ও পুলিশ এসে হাজির হল, তারা দেখল, শেখরবাবুর বুকে পিন্ দিয়ে আঁটা একখণ্ড কাগজ। তাতে লেখা রয়েছে ৮—৩; আর কাছেই পাওয়া গেল একটা ভাঙ্গা টর্চ্চ, একখানি রুমাল ও চামড়ার মত খুব পাতলা একটা রবারের টুক্রো।

টর্চ্চ ও রুমালখানি সুজিতের। কিন্তু ঐ পাত্‌লা রবারটা যে কার, ও কি তার উদ্দেশ্য, কিছুই বুঝা গেল না। যাই হোক্, তবু এটুকু স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সুজিত ও তার বিপক্ষের মাঝে একটা প্রকাণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেছে, আর এই বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলো তারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

এগারো

শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন, এত সকালে হয়ত দেখা যাবে বারীন তখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর নয়ত বন্ধু ও সহকারী সুজিতের আকস্মিক বিপদে শোকে মুহ্যমান হয়ে. চিন্তিতভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। কিন্তু এসেই যখন শুনতে পেলেন যে, বারীন বাড়াতে ফেরা অবধি তার ল্যাবরেটারীতেই কি পরীক্ষা করছে, তখন তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। তিনি বুঝলেন. বারীন হয়ত একটা-কিছু সূত্র আবিষ্কার করেছে। তাই তিনি বারীনকে বিরক্ত না করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল চা খেয়েই তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বারীন তার ল্যাবরেটারী থেকে বেরুল প্রায় চার ঘণ্টা পরে। এসেই শশাঙ্কবাবুকে দেখে সচমকে বলল, "কি খবর ? কতক্ষণ যাবৎ এসেছেন ?"

—"পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি বসে আছি তোমারই আশায় বারীন ! বলি, ল্যাবরেটারীতে তন্ময় হয়ে কি এমন দেখছিলে ? কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারলে ?"

বারীন হেসে বলল, "হাঁ, সবই বলছি শুনুন। সংক্ষেপে বলব, মন দিয়ে শুনুন, সময় বড্ড কম।"

এই বলে সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ্ করে তাতে বসে পড়ল, তারপর বলতে লাগল :

"দেখুন, রায়বাহাদুর হরলাল মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি সীল-করা চিঠি তাঁর উকীল আশুবাবুকে দিয়ে অনুরোধ করেন যে, তাঁর যদি কোনরকম অস্বাভবিক মৃত্যু হয়, তাহলে যেন চিঠিখানি আমাকে দেওয়া হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর আশুবাবু আমাকে একখানি চিঠি দেন বটে, কিন্তু আমি বুঝে নিয়েছিনুম চিঠিখানি জাল। নইলে সেই বন্ধ-চিঠির ওপরে আশুবাবুর আঙুলের ছাপ থাকবে কেন?

কাল রাতে নিহত আশুবাবুর পকেটেই আমি সেই আসল চিঠিখানি পেয়েছি। তাতে লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু সে তাঁকে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হতে লিখেছিল।

রায়বাহাদুর পুলিশকে দেবার জন্যে চিঠিখানি তাঁর উকীল আশুবাবুকে দেন এবং তখনই বলেন, "কোনরকমে তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি খুনীকে গ্রেপ্তারের জন্যে বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে যাবেন।

উকীল আশুবাবু পরামর্শ দেন, পুলিশকে না জানানোই ভাল। তার চেয়ে তিনি নিজেই কয়েকজন লোক দিয়ে রায়-বাহাদুরকে রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই পুলিশে খবর দেওয়া হল না। রায়বাহাদুর রমেশ দত্ত পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কোনো সাহায্য পাবার আগেই তিনি পরপারে চলে যান।

নিহত রমেশ দত্তের বুকে আঁটা ৮—১ এই লেবেল দেখে, তারপর হরলাল নিজে একটা ভয় দেখানো চিঠি পেয়ে,

স্বভাবতঃই খুনী ও তার কর্ম্মপদ্ধতি-সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন। এবং এটাও তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, এই খুনী অরুণ ব্যানার্জ্জি ছাড়া আর কেউ নয়।

রায়বাহাদুর হরলাল এরপর যে পন্থা অবলম্বন করলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অরুণ ব্যানার্জ্জির বাড়ী-ঘর কোথায় সে খবর নিলেন। নানা ইনসিওর কোম্পানী খোঁজ করে অবশেষে জানলেন, 'সান লাইফ্' কোম্পানীতে তার জীবন বীমা ছিল। তাদের অফিসে অনুসন্ধান করে জানলেন, অরুণ ব্যানার্জ্জির বাঁ-হাতে উল্কি আছে—তাতে লেখা আছে তার নাম A. Banerjee.

এইভাবে রায়বাহাদুর তাঁর চিঠিতে খুনীর একটা প্রকাণ্ড চিত্রের কথা লিখে গেলেন। কিন্তু আশুবাবু নিজেই খুনীকে গ্রেপ্তার করে বিশ হাজার টাকা লাভ করবার উদ্দেশ্যে আমাকে দিলেন একটা বাজে চিঠি।

কাজেই আমাকে রাখতে হল আশুবাবুর ওপর গুপ্তচর। তিনি কোথায় যান, কি করেন, তারই অনুসন্ধান করতে গিয়ে শেখর বোসের বাড়ীতে প্রথমে গেল সুজিত; তারপর ফোনে তার খবর পেয়ে পরে যাই আমি। সেখানে যা হয়েছে, তা আপনি জানেন। আর আপনি একথাও জানেন যে, কাল সেখানে সুজিতের ভাঙ্গা টর্চ্চ ও রুমাল ছাড়া, খুব পাতলা একটা রবারও পাওয়া গেছে।

আমি সেই রবারটা খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে

পেরেছি, অরুণ ব্যানার্জ্জি তার হাতের উল্কির ওপর এই রবারটা সুন্দরভাবে বসিয়ে দিয়ে, উল্কিটা ঢেকে রেখেছিল। গায়ের রঙের সাথে মেশাবার জন্যে রবারের পাতের ওপর খুব হাল্‌কা অথচ পাকা একটা রং লাগানো রয়েছে। কাজেই মনে হচ্ছে, খুনী যে. সে আমাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়িয়েছে সাধারণ লোকের মতই। কিন্তু এখন থেকে তাকে তার বাঁ-হাত সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। কারণ, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার সেই উল্কি ঢাকা দেবার রবারটা পড়ে গেছে।

যাই হোক্, এখন একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আজই রাতের অন্ধকারে আমাদের কোনো অভিযানে বেরুনো উচিত। কিন্তু পাব্‌লিক প্রসিকিউটার উমেশ নিয়োগী খানিক আগে যেভাবে রাত ৯টায় তাঁর ওখানে একটা পার্টির নিমন্ত্রণে আমায় অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন, তাতে রাত ১১টার আগে আমি আপনার সাথে যেতে পারি না। কাজেই, প্রথমে যেতে হবে আপনাকে একাই।”

—“কোথায় যেতে হবে?” শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—“তা জানি না। কারণ, আপনার এই অভিযানের নেতা হবে আমার শিকারী কুকুর—রাঘব।”

বারো

ঘণ্টা-দুয়েক পরে শেখর বোসের বাড়ীতে—ঘটনাস্থলে উদয় হলেন ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্কবাবু। তাঁর সাথে প্রকাণ্ড একটা শিকারী কুকুর। কুকুরটি বারীনের, নাম তার রাঘব। আশুতোষবাবুর মৃতদেহ তখন আর সেখানে পড়ে নেই,—পরীক্ষার জন্যে তা মর্গে চালান দেওয়া হয়েছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ এবং নির্জন দেখে শশাঙ্কবাবু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। যেখানে সেই হাতের রবারের টুক্‌রোটা কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে এসে তিনি দাঁড়ালেন, তারপর অস্পষ্টস্বরে বললেন, "তুমি যেই হও, আজ তোমার রক্ষা নেই বন্ধু! তোমার দেহের রবারই আজ তোমার বাসস্থানের সন্ধান দেবে আমায়।"

তিনি শিকারী-কুকুরটার পিঠ কয়েকবার চাপড়ে নিম্নস্বরে বললেন, "তোর সাহায্যেই আজ সেই সাঁড়াশির রহস্য ভেদ করব রাঘব। সুতরাং খুব সাবধান! শত্রুপক্ষ আমাদের অস্তিত্ব যেন টের না পায়।"

শশাঙ্কবাবু সেই রবারের টুক্‌রোটা পকেট থেকে বের করলেন। তারপর সেটা রাঘবের নাকের কাছে শূন্যে কয়েক-বার আন্দোলন করলেন।

রাঘব তার মুখ তুলে কয়েকবার সেই রবারটা শুঁক্‌ল।

তারপর মাথা নীচু করে মাটিতে কি শুঁকতে শুঁকতে চারিদিক ঘুরে বেড়াল। তারপর একবার শশাঙ্কবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হল।

রাঘব অন্ধকারে নিঃশব্দে প্রায় পনেরো মিনিট চলে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর একবার সেই বাড়ীটা এবং একবার শশাঙ্কবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝাবার চেস্টা করতে লাগল। শশাঙ্কবাবু বুঝতে পারলেন যে, রাঘব বোঝাতে চাইছে তার শিকার এই বাড়ীতেই এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

শশাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে সেই বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে কি চিন্তা করলেন। তারপর মনে মনে একটা মতলব স্থির করে রাঘবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই এখানে অপেক্ষা কর রাঘব। আমি ঐ বাড়ীটার ভেতরে প্রবেশ করছি।"

শশাঙ্কবাবু আর অপেক্ষা না করে অতি সাবধানে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ীটার দিকে অগ্রসর হলেন।

বাড়ীর সদর দরজা খোলা দেখে শশাঙ্কবাবুর মনে হল যে কেউ হয়ত এইমাত্র বাইরে বেরিয়েছে। তিনি চারিদিকে তাকালেন, কিন্তু কোথাও কাউকেই দেখা গেল না। তখন তিনি সেখানে আর অপেক্ষা না করে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

খানিকটা এগিয়েই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই একটা ঘরে দুজন লোক কথা বলছিল। তাদের গলার স্বর

স্পষ্ট ভেসে আসছিল। শশাঙ্কবাবুর মনে হল, ভেতরে বক্তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন সুজিত।

শশাঙ্কবাবু অতি সন্তর্পণে সেই ঘরের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরে একটা উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে দৃষ্টিপাত করে তার হৃৎকম্প হতে লাগল।

তিনি দেখতে পেলেন, ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে সুজিতবাবু বসে আছে। তার হাত-পা চেয়ারের সাথে শক্ত করে-বাঁধা। আর তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একজন মুখোস-পরা লোক।

মুখোস-পরা লোকটি অস্থিরভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছিল। হঠাৎ সে থেমে সুজিতের দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে তুমি বলবে না সেই চিঠি কোথায় রেখেছ?"

সুজিত নিরাশার স্বরে বলল, "একথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, আশুতোষবাবুর কাছে কোনো চিঠিই আমি দেখতে পাইনি। যে-চিঠির বিষয় আমি কিছুই জানি না, তার সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মোটেই।"

মুখোসধারী বলল, "এই কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?"

সুজিত বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করা না-করা সম্পূর্ণ তোমার অভিরুচি।"

অবিশ্বাসের সুরে মুখোসধারী বলল, “বেশ! কিন্তু আশুতোষবাবুর সাথে-সাথে তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলে কেন? এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে এ-সংবাদ তুমি কি উপায়ে জানতে পেরেছিলে?”

সুজিত বলল, “সে-সংবাদ তোমার জেনে কোনো লাভ হবে না। তবে এটুকু জেনে রাখ যে তোমার এই লীলাখেলা আর বেশী দিন চলবে না। এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে ফাঁসি-কাঠে করতে হবে অরুণ ব্যানার্জ্জি।”

সুজিতের কথা শুনে মুখোসধারী হেসে বলল, “আমার পরিচয়টাও তোমার অজ্ঞাত নেই দেখতে পাচ্ছি। সেই চিঠিটা থেকেও তুমি হয়ত আমার সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে পেরেছ। কিন্তু সেসব এখন আর তোমার কোনো কাজেই আসবে না গোয়েন্দা! তুমি আমার কবল থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার পাবার আশা ত্যাগ কর। অবশ্য তোমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করতে হবে না এটুকু আমি বলতে পারি। তোমার বন্ধু ও গুরু প্রাইভেট-ডিটেকটিভ বারীন চাটার্জ্জিও তোমার সাথে পরলোকের পথে যাত্রা করবে। শীঘ্রই সে এখানে এসে তোমার সাথে মিলিত হবে।”

শশাঙ্কবাবু একমনে এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। হঠাৎ তাঁর ঠিক পেছনেই কারও পদশব্দ শুনতে পেয়ে তিনি ফিরে তাকালেন। পেছন ফিরেই তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর হাত-দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশালাকার মূর্ত্তি।

শশাঙ্কবাবু বুঝলেন যে, তাঁর গোপন থাকা বৃথা হয়েছে। তিনি আত্মরক্ষার জন্যে পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু রিভলভারটা বের করবার আগেই আগন্তুক তার হাত তুলে একটা ভারী কিছু দিয়ে তাঁর মস্তকে প্রচণ্ড একটা আঘাত করল। শশাঙ্কবাবু সেই প্রচণ্ড আঘাত সামলাতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হারাবার আগে তার কানে অস্পষ্ট ভেসে এল একটা বিদ্রূপপূর্ণ অট্টহাসি।

তেরো

জ্ঞান হবার পর শশাঙ্কবাবু দেখতে পেলেন যে, সুজিত তার দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শশাঙ্কবাবুকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছেন আপনি ? এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন ত ?"

শশাঙ্কবাবু প্রথমে বুঝতে পারলেন না যে তিনি কোথায় ! তারপর ধীরে-ধীরে রাতের সমস্ত কথাই তাঁর মনে পড়ল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তারা দুজন একটা ছোট ঘরে বন্দী।

শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকিয়ে সুজিত বলল, "আপনি এখানে এসেছিলেন কি করে ? আমার মত আপনিও কি এদের ফাদে পা দিয়েছিলেন নাকি ?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "সেকথা পরে শুনো। এখন আগে বল, তুমি এখানে এলে কি করে ?"

সুজিত তখন শেখর বোসের বাড়ী থেকে তার এখানে আসা অবধি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। এরা কোন্ চিঠির জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ? মনে হচ্ছে যে, আশুতোষবাবুর সাথে কোনো চিঠি ছিল এবং সেটা তাঁর মৃত্যুর পর পুলিশের হস্তগত হয়েছে এই অনুমান করেই এরা আমাকে বন্দী করে এনেছে। এদের সেই অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে

হবে, চিঠিখানা নিশ্চয়ই বারীনের হাতে পড়েছে। কারণ, আমি দেখেছিলাম, সে একবার তার পকেটগুলো তাড়াতাড়ি হাতড়ে নিয়েছিল।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "এদের আশঙ্কা সম্ভবতঃ ভুল নয় সুজিত! এদের ভয় হয়েছিল যে, ঐ চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে এদের বিপদ ঘটতে পারে। এবং এই আশঙ্কাতেই এরা তোমাকে ধরে এনেছে সেই চিঠি উদ্ধার করবার জন্যে। তারপর এরা তোমাকে হত্যা করে নিরাপদ হবে আশা করেছিল। কিন্তু সেই অনুমান যে কত ভুল, তা এরা এখনও বুঝতে পারেনি। আমি জোর করেই বলতে পারি, সেই চিঠি নিশ্চয়ই এখন বারীনের হাতে রয়েছে।"

সুজিত আগ্রহভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "সেই চিঠির মর্ম্মও আশা করি আপনার অজ্ঞাত নয়?"

শশাঙ্কবাবু একটু হেসে বললেন, "অন্ততঃ সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।"

এই বলে খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বললেন, "চিঠিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে হত্যাকারী অরুণ ব্যানার্জ্জিকে গ্রেপ্তারের সুবিধা হয়। কাজেই চিঠিখানা অরুণ ব্যানার্জ্জির কাছে এত বেশী দরকারী। আর আশুবাবুর কাছে তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই অন্য কারণে। লোভী উকীল-মানুষ তিনি; দেনা-পাওনা নিয়েই তাঁর সম্পর্ক বেশী। চিঠিতে নিশ্চয়ই এমন কিছুর সন্ধান ছিল, যাতে তার বেশ মোটা কিছু

লাভ হতে পারে। কাজেই আশুবাবুর কাছেও চিঠির গুরুত্ব খুব কম ছিল না, একথা সহজেই বুঝতে পারা যায়।"

সুজিত তাঁর কথা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে গম্ভীরস্বরে বলল, "এরা আমাদের কোথায় এনে বন্দী করেছে বলতে পারেন?"

শশাঙ্কবাবু একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আমার কথা বোধহয় তোমার বিশ্বাস হবে না সুজিত! আমরা যেখানে বন্দী হয়ে আছি সেই বাড়ীটা আর কারও নয়—প্রসিদ্ধ পাবলিক-প্রসিকিউটার উমেশ নিয়োগীর বাড়ী। এবং এটাও সম্ভবতঃ তোমার অজানা নয় যে, উমেশ নিয়োগী অরুণ ব্যানার্জ্জির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেছিলেন!"

সুজিত বলল, "কিন্তু আমাদের বন্দী করার সাথে উমেশ নিয়োগীর কোনো সম্বন্ধ নেই একথা খাঁটি সত্যি। আমার মনে হয়, এই বাড়ীতে আমাদের বন্দী করা হয়েছে পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার জন্যে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, আমাদের মত উমেশবাবুও তাঁর নিজের বাড়ীতে কোথাও বন্দী হয়ে আছেন। অরুণ ব্যানার্জ্জি এবার এক জালে তার সব শত্রুকেই ধ্বংস করবার আয়োজন করেছে।"

তার কথা শেষ হতে না-হতেই দরজার বাইরে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক। তাদের প্রত্যেকের মুখই মুখোসে ঢাকা।

তাদের ভেতরে একজন লোক এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে প্রস্তুত হও বন্ধুগণ। এবার একসাথে তোমাদের সবাইকে পরলোকের পথে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমি আমার আরব্ধ কর্তব্য শেষ করব। তোমাদের মৃত্যুর পর অরুণ ন্যাপাঙ্কি অদৃশ্য হবে, কেউ আর তার সন্ধান পাবে না। আমার জীবিত বাকি-শত্রুদের সাথে তোমাদের ধ্বংস হবার পর আমি নূতন মূর্তি নিয়ে উদয় হব। আজ সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভেতরে তোমরা তাদের দর্শন করে আনন্দিত হবে সন্দেহ নেই।"

সুজিত বলল, "তুমি তোমার শত্রুদের এখানে নিমন্ত্রণ করে তাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে চাও?"

মুখোসধারী হেসে বলল, "ঠিক তাই। তারা উমেশ নিয়োগীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ দেখতে পাবে না। উগ্র-চেতনানাশক ঔষধ মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পর তাদের চেতনা বিলুপ্ত হতে দেরী হবে না। তারপর তাদের জ্ঞান ফিরে এলে তারা দেখে বিস্মিত হবে যে তারা সাঁড়াশির আলিঙ্গনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, "অদ্ভুত তোমাদের শয়তানী! তবে এইজন্যেই বুঝি তুমি আজ বারীনকেও নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছ? কিন্তু মানুষের বিচারের হাত এড়াতে সক্ষম হলেও তুমি ভগবানের বিচার এড়াবে কি করে বলতে

পার? এতগুলো নরহত্যার কোন্ সদুত্তর তার কাছে তুমি দেবে, ভেবে দেখেছ?"

মুখোসধারী হেসে বলল, "সেই উপদেশ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ইনস্পেক্টর। ভগবানের বিচার? হা-হা-হা! একজন নির্দোষীর যখন নরহত্যার অপরাধে কঠিন শাস্তি হয়েছিল, তখন ঐ ভগবান কোথায় ছিলেন?"

সেই গুরুগম্ভীর এবং কঠিন কণ্ঠস্বরে শশাঙ্কবাবুর বুকে যেন হাতুড়ী পড়ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে এই উন্মাদগ্রস্ত নরঘাতকের কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা একেবারেই অসম্ভব।

সুজিত কিছু চিন্তা করছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, "তুমিই তাহলে এই মারাত্মক রহস্যের নেতা সেই অরুণ ব্যানার্জি?"

মুখোসধারী হেসে বলল, "হ্যাঁ। আমিই তোমাদের লক্ষস্থল অরুণ ব্যানার্জি। আমার মুখে মুখোস থাকার দরুণ তোমাদের মনোদুঃখের কোনো কারণ নেই বন্ধুগণ! তোমাদের সম্মিলিত দলের দণ্ড ঘোষণার সময়ে তোমরা আমার আসল রূপ দেখে ধন্য হবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহই আমি রাখতে চাই না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত রহস্য তোমাদের কাছে আমি প্রকাশ করব এবং সেই শুভলগ্নের আর বেশী দেরী নেই। তোমরা তৈরি থেকো।"

চৌদ্দ

গভীর রাত্রে কুকুরের চীৎকারে এবং একটা অস্বাভাবিক গোলমালে শশাঙ্কবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসেই দেখতে পেলেন, সুজিত তার আগেই উঠে বসেছে।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি সুজিত? এত রাত্রে কুকুর এবং লোকজনের কোলাহলের কারণ কি?"

সুজিত বলল, "আমার মনে হচ্ছে, আমাদের উদ্ধার পাবার আর দেরী নেই শশাঙ্কবাবু। ঐ কুকুরের চীৎকার আর কারও নয়—রাঘবের। তার গলার স্বর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। বারীন বোধহয় পুলিশ নিয়ে এসেছে আমাদের উদ্ধার করতে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তারা আমাদের সন্ধান পেয়ে এখানে আসবে কি করে? অসম্ভব। আমার মনে হয় ব্যাপার অন্য কিছু।"

সুজিত বলল, "না! আমার ভুল হয়নি। রাঘবকে সাথে নিয়ে আপনি যে কেমন করে এখানে এসেছেন, সে তো শুনেছি! সেই রাঘব এখান থেকে ফিরে গিয়ে বারীনকে সাথে নিয়ে ফিরে এসেছে। সে জানত যে আপনি রাঘবের সাথে এই নৈশ-অভিযানে বেরিয়েছিলেন। রাঘবকে একলা ফিরে

যেতে দেখে তার মনে সন্দেহ হয়েছে যে আপনার নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে। এবং সে পুলিশ নিয়ে উদ্ধার করতে এসেছে।"

সেই কোলাহল ক্রমশঃ স্পষ্ট হল। পুলিশ-হুইসিলের শব্দ আর কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতক্ষণে শশাঙ্কবাবু বুঝতে পারলেন যে, বারীন সত্যই পুলিশ নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'জয় ভগবান! কে বলে তোমার বিচার নেই! নইলে এমন অদ্ভুতভাবে সাহায্য এসেই বা উপস্থিত হবে কেন?"

শশাঙ্কবাবুর কথা শুনে সুজিত বলল, "এখনও আমরা সাঁড়াশির হাতে বন্দী আছি একথা ভুলবেন না। সাঁড়াশির অধিকারী যে সহজে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করবে, তা আমার মনে হয় না।"

সুজিতের আশঙ্কাই সত্য হল। প্রায় পনেরো মিনিট পুলিশের সাথে গুলি চালনার পর অরুণ ব্যানার্জ্জির অনুচরেরা স্তব্ধ হল।

পুলিশ অগ্রসর হয়ে বাড়ীটার সামনে এসে উপস্থিত হল। তারপর দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করল।

এমন সময়ে সুজিতের নাকে পেট্রলের গন্ধ ভেসে এল। সে শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করবার আগেই অরুণ ব্যানার্জ্জি আমাদের পুড়িয়ে

মারবার ব্যবস্থা করেছে শশাঙ্কবাবু! পেট্রলের সাহায্যে এই বাড়ীতে আগুন লাগান হবে বোধ হচ্ছে।”

একটু পরেই সেই ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে আগুনের লোলজিহ্বা দেখা গেল। সুজিত এবং শশাঙ্কবাবু স্পষ্ট বুঝলেন যে তাঁদের মৃত্যু অবধারিত। পুলিশ তাদের সন্ধান পাবার আগেই আগুনের উত্তাপে তারা এই বাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এবং তার ফলে তাদের দুজনের ঘটবে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

আগুন এবং উত্তাপ ক্রমশঃ তাদের কাছে অসহ্য বোধ হল। চারদিকে আগুনের ছস্ ছস্ এবং পুলিশের কোলাহল! চীৎকার করলেও কোনো ফল হবেনা। কারণ, তাদের আর্তনাদ কারও কর্ণগোচর হবে না। চিন্তা করে সুজিত হাতের বাঁধন খোলবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু সেই বাঁধন খোলা সম্ভব হল না। অগত্যা সুজিত নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করল।

এমন সময়ে হঠাৎ দরজার বাইরে কুকুরের তীব্র চীৎকার এবং কতকগুলি লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে সুজিতের মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল। সেই চীৎকার শুনে সে বুঝতে পারল, রাঘব তার স্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তির দ্বারা তাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। একটু পরেই ঘরের দরজার বাইরে থেকে তীব্রভাবে করাঘাত করে কেউ চীৎকার করে উঠল, “শশাঙ্ক-বাবু? আপনি কোথায়?”

শশাঙ্কবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, "আমি ও সুজিত এই ঘরে বন্দী আছি বারীন! শিগ্গির ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেল—নইলে আমাদের সবাইকে পুড়ে মরতে হবে।"

পাঁচ মিনিট পরে সেই ঘরের দরজা উন্মুক্ত হল। সুজিত এবং শশাঙ্কবাবুকে মুক্ত করে বারীন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "তোমাদের জীবন রক্ষার জন্যে সমস্ত প্রশংসাই রাঘবের প্রাপ্য, আমার নয়। তার কাছে সন্ধান পেয়ে এবং তার দ্বারা চালিত হয়েই আমরা এখানে সময়মত উপস্থিত হতে পেরেছি। সে আমাদের সাথে না থাকলে তোমাদের খুঁজে পাবার কোনো আশাই ছিল না। তার আগেই আগুনে এই বাড়ী ধ্বংস হত।"

একটু থেমে সে বলল, "কিন্তু এখানে আর দেরী নয়। আমি দেখেছি, উপরে উঠবার সিঁড়িতে আগুন ধরেছে। সিঁড়িটা ভেঙ্গে পড়বার আগেই আমাদের নীচে নামতে হবে। শিগ্গির এস।"

এই বলে সে রাঘবের পিঠ চাপড়ে বলল, "আয় রাঘব।"

পনেরো

পরদিন সকালে শশাঙ্কবাবু এসে হতাশার স্বরে বললেন, "না ! সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হল। উমেশ নিয়োগীর বাড়ীতে অরুণ ব্যানার্জ্জির কোনো সন্ধানই পেলাম না। পুলিশ বাড়ীটার চারদিক ঘিরে ছিল, সুতরাং সেই বাড়ী থেকে কেউ যে তাদের অগোচরে পলায়ন করতে পারেনি এ-কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার বারীন ! তবে অরুণ ব্যানার্জ্জি এবং তার দলবল গেল কোথায় ? সেই ধ্বংসাবশেষ-বাড়ীটার ভেতরে একটা অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেটা পুড়ে এমন বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে যে তাকে সনাক্ত করবার কোনো উপায় নেই। আমার মনে হয় যে সেটা ঐ অরুণ ব্যানার্জ্জিরই কোনো অনুচর হবে। সে সময়মত পলায়ন করতে না পেরে পুড়ে মরেছে।"

বারীন বলল, "কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। ওটা অরুণের দলের কোনো লোকের দেহ নয়—অন্য কারও। এখন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীর মালিক উমেশ নিয়োগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি একথা ভুলে যাবেন না যেন !"

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বারীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি বলতে চাও ?"

বারীন বলল, "আমি বলতে চাই যে, ওটা উমেশ নিয়োগীর মৃতদেহ হলেও আমি আশ্চর্য্য হব না। অরুণ ব্যানার্জ্জি তার

দলবল সমেত সুস্থ-দেহেই পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে পলায়ন করেছে সন্দেহ নেই।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "এত করেও নিশাচর সাঁড়াশির হাতে আমরা দড়ি দিতে পারলাম না। সে আমাদের জালে পড়েও অতি অদ্ভুত কৌশলে অন্তর্ধান হল। মাঝখান থেকে মারা পড়ল উমেশ নিয়োগী!"

বারীন বলল, "কিন্তু অরুণ ব্যানার্জ্জির খেলা সমাপ্ত হয়েছে শশাঙ্কবাবু! কাল রাত্রে আমরা তার হাতে দড়ি দিতে না পারলেও, সে-কাজ আজ অতি অবশ্যই সিদ্ধ হবে।"

এবারে আপনি থানা থেকে তৈরি হয়ে আসুন! জন-ছয় সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে করে আপনি আশুবাবুর বাড়ীতে আমার সাথে দেখা করবেন।"

—"আশুবাবুর বাড়ীতে?"

—"হাঁ। অনেকদিন সে-বাড়ীর কোনো খোঁজ-খবর জানিনা। কাল দৈবাৎ তাঁর কর্ম্মচারী জহরের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বললে—আশুবাবুর মৃত্যু-সময়ে তাঁর পরিবারের কেউই এখানে ছিলেন না, সবাই পুরীতে গিয়েছিলেন চেঞ্জে। দুঃসংবাদ শুনে সবাই ছুটে এসেছেন। সেই অবধি কেউ না-কেউ সর্ব্বদাই অসুখ-বিসুখে ভুগছেন।

জহর ছোক্‌রাও সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছে; দেখলুম, তার হাতে বেশ পুরু এক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।"

বারীন এই বলে একবার খানিকটা বিশ্রাম করে নিল।

তারপর আবার বলল, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আশু-বাবুর কোনো রিভলভারের লাইসেন্স ছিল কি না। সে বললে—লাইসেন্স ছিল। আমার অনুরোধে সে তার লাইসেন্স-নম্বরটাও লিখে দিয়েছে। এই দেখুন—" বলে বারীন তার পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে দেখাল।

শশাঙ্কবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার এ-সব কথার কোনো মানে হয় বারীন? লাইসেন্স-নম্বর তো চেষ্টা করলে আমরাই খুঁজে বার করতে পারি। সেজন্যে তোমার অত মাথা-ব্যথাই বা কেন, আর সেখানে যাওয়ার এত আগ্রহই বা কেন?"

মৃদু হেসে জবাব দিল বারীন, "বাঃ! কি বলছেন আপনি ইনস্পেক্টরবাবু? পরিচিত একজন ভদ্রলোক এমনভাবে মারা গেলেন, তার বাড়ীর একটা খোঁজ-খবর নেব না? কাজেই আমি তখনই তাকে বলে দিয়েছি যে, খানিকটা পরেই আমি তাদের বাড়ীতে যাচ্ছি। আর আমি জানি যে, আমার এই যাওয়ার খবরটা কখনো গোপন থাকবে না। কাজেই, খুনী অরুণ ব্যানার্জি আমাকে আজ সেখানেই অভ্যর্থনা করবার জন্য তৈরি হয়ে থাকবে। সেই জন্যেই কয়েকটি পুলিশ নিয়ে আপনাকেও যেতে বলছি।"

শশাঙ্কবাবু প্রস্থান করবার প্রায় মিনিট-পনেরো পরে বারীন আশুবাবুর ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়াল। জহর তখন সেইখানে বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল। বারীনকে দেখেই সে তাকে অভ্যর্থনা করে বলল—"আসুন বারীনবাবু, আসুন! আমি

সেদিন আপনাকে কোনো কন্‌গ্রেচুলেট পর্য্যন্ত করি নি, এ আমার বড্ড অভদ্রতা হয়েছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আপনাদের অতি অদ্ভুতভাবে রক্ষা করেছেন।"

বারীন হেসে বলল, "আপনি ভুল করছেন জহরবাবু! বিপদ্‌ তো আমার হয়নি, বিপদ্‌ হয়েছিল আমার বন্ধু সুজিতের, আর ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্কবাবুর। বরং আমি সেখানে যাওয়ায় অরুণ ব্যানার্জ্জির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে নি।"

জহর একটু হেসে বলল, "তাহলে তো অরুণ ব্যানার্জ্জির এখন বড় শত্রুই হচ্ছেন আপনি। কিন্তু তার কি কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না? মাঝখান থেকে মারা পড়ল নিরীহ উমেশ নিয়োগী?"

বারীন বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তিনিও নিরীহ ছিলেন না। কারণ, তিনিও ঐ সাঁড়াশি-দলের শত্রুদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাই হোক, আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে, অরুণ ব্যানার্জ্জির সন্ধান আমরা পেয়েছি। নিহত হরলালবাবু মারা গেলেও, তিনি আমাদের এমন একটি সন্ধান দিয়ে গেছেন যার সাহায্যে অরুণ ব্যানার্জ্জির মুখোস খুলতে আমাদের বিশেষ অসুবিধে হবে না।"

জহর বলল, "কি সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন? সেই সূত্রের সাহায্যে আপনারা তাকে গ্রেপ্তার করেন নি কেন এখনও?"

বারীন বলল, "কিন্তু তাতে একটু অসুবিধে আছে জহর-

বাবু! সেই অসুবিধেটুকু কাটাবার জন্যেই আমি আপনার সাহায্য চাই।"

জহর বলল, "কি সাহায্য বলুন?"

বারীন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "প্রথমত একটা খবর আমি চাই। শেখরবাবুর মৃত্যুর দিন তাঁর বাড়ীতে আপনিও গোপনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলতে পারেন?"

জহর বিস্মিতভাবে বলল, "আমি? আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম?"

দ্বিগুণ দৃঢ়ভাবে বারীন বলল, "হ্যাঁ, আপনিই ছিলেন।"

বারীনের কথা শেষ হতে না-হতেই শশাঙ্কবাবু সদলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে বারীন হেসে বলল, "আপনি ঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছেন দেখছি।"

তারপর সে জহরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি এখনো আমার কথা বুঝতে পারছেন না জহরবাবু? তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলছি।

সেদিন শেখরবাবুর বাড়ীতে তাঁর চাকর-বাকর বা আত্মীয়-স্বজন কেউ উপস্থিত ছিল না। তাঁর এক আত্মীয়ের কঠিন ব্যায়রামের সংবাদ শুনে সবাই সেখানে চলে গিয়েছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, সবাই ফিরে এলে যাবেন শেখরবাবু নিজে।

অরুণ ব্যানার্জ্জি কোনরকমে সেই খবরটা পেয়ে স্থির করলে, ঠিক সেই দিনই সে তার মরণ-সাঁড়াশির প্যাঁচ কষবে।

সে তখুনি তার এক অনুচর নিয়ে শেখরবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হল। আশুবাবু শুনতে পেলেন যে অরুণ ব্যানার্জ্জি শেখর বোসের বাড়ীতে যাচ্ছে। তিনিও সেদিকে রওনা হলেন।

সুজিত ছিল আশুবাবুর পেছনে গোয়েন্দার মত। সে তাঁকে অনুসরণ করে শেখর বোসের বাড়ীতে উপস্থিত হল। কিন্তু যাবার আগে সে আমাকে টেলিফোনে একটা খবর দিয়ে যেতে ভুল করেনি। টেলিফোনে তার খবর পেয়ে আমিও শেখর বোসের বাড়ীতে উপস্থিত হই। সুতরাং শেখর বোস নিজে ছাড়া সেখানে আমাদের মত অতিথির সংখ্যা হ'ল পাঁচটি। এবং এই পাঁচজন লোকের ভেতরেই একজন লোক শেখরবাবুকে হত্যা করেছিল। আর ঐ হত্যাকারীই যে অরুণ ব্যানার্জ্জি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

হরলালবাবুর আসল চিঠি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, অরুণ ব্যানার্জ্জির ডান হাতে একটা কালো রংয়ের উল্কি রয়েছে। তাতে ইংরাজি অক্ষরে লেখা আছে—এ, ব্যানার্জ্জি। সুতরাং আপনাদের আপত্তি না থাকলে শশাঙ্কবাবুর সামনে আমি আপনাদের সকলের হাত পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তাই জহরবাবুকেও অনুরোধ করছি, আপনার হাতের ঐ ব্যাণ্ডেজটি খুলে ফেলুন।"

বারীনের কথা শেষ হতে না হতেই জহর লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে একটা ছোট রিভলভার বের করে বারীনকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

বারীন সেজন্য তৈরি ছিল। সে পাশ কাটিয়ে সেই গুলি ব্যর্থ করল। তারপর তাকে আর গুলি করবার সুযোগ না দিয়েই সে তাকে লক্ষ্য করে রিভলভার তুলল। পর-পর দুবার তার রিভলভার অগ্নি-বমণ করল। জহরের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

শশাঙ্কবাবু চীৎকার করে বললেন, "এ কি করলে বারীন? লোকটাকে গুলি করে মারলে?"

বারীন একবার জহরের দেহের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ! ফাঁসিকাঠে যার মরা উচিত ছিল তাকে গুলি করে মেরে তার প্রতি দয়া দেখানো হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে হত্যা না করলে তার বদলে আমারই মৃতদেহ এখানে দেখতে পেতেন। এই জহরই ছদ্মবেশে অরুণ ব্যানার্জ্জি।"

কথা বলতে বলতে বারীন জহরের দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর তার ডান-হাতখানা তুলে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতেই দেখা গেল একটা কালো উল্কি—ইংরাজি অক্ষরে স্পাস্ট লেখা রয়েছে—এ, ব্যানার্জ্জি।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে বারীনের কাণ্ড দেখছিলেন। তিনি জহরের হাতের সেই উল্কিটার দিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কি সর্ব্বনাশ! উকীল আশুবাবুর নিরীহ কেরাণীর ছদ্মবেশে অরুণ ব্যানার্জ্জিই এই রহস্যের নেতা! এ-যে বিশ্বাসের অযোগ্য বারীন!"

বারীন বলল, "হ্যাঁ! তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার

সুযোগের জন্যেই অরুণ ব্যানার্জ্জি এই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিল। কেউ কোনদিন একথা ভাবতেও পারেনি যে, একটা অখ্যাত নিরীহ কেরাণীর ছদ্মবেশে সে নিজেই ছিল হত্যাকারী অরুণ ব্যানার্জ্জি!"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "এই প্রচ্ছন্ন নরঘাতককে আবিষ্কার করার সমস্ত বাহাদুরিই তোমার বারীন! কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে তুমি জহরের ছদ্মবেশী অরুণ ব্যানার্জ্জিকে চিনতে পেরেছিলে বৎস?"

বারীন হেসে বলল, "মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা। ব্যাপারটা এত জটিল হত না, যদি মাঝখান থেকে আশুতোষবাবু বাহাদুরি করতে না যেতেন। তাঁর লোভের জন্যেই অরুণ ব্যানার্জ্জির অস্তিত্ব আমরা এতদিন জানতে পারিনি। অবশ্য তাঁর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে নিজের জীবন দিয়ে করতে হয়েছে।"

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এত লোক থাকতে কোন্ প্রমাণের বলে তুমি এই জহরকে অরুণ ব্যানার্জ্জি বলে সন্দেহ করেছিলে?"

বারীন বলল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রথম সন্দেহ পড়েছিল আশুতোষবাবুর উপর। আমার ধারণা হয়েছিল যে তাঁর মক্কেলকে প্রতারিত করবার মতলবেই তাঁর এই চাল। কারণ, সীল-করা চিঠি যে আশুতোষবাবুই চুরি করেছিলেন তার প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছিলাম।

কিন্তু নিহত হরলালবাবুর ডায়েরী এবং সেটার ভেতরে

পাওয়া ঐ চিঠিই আমার সেই ভ্রম সংশোধন করে দেয় সেই চিঠি এবং ডায়েরীটাই আমাকে ঠিক পথে চালিত করে শেষ পর্যান্ত।

তখন আমি আশুতোষবাবুর দিকে নজর রাখলাম। কারণ, এটুকু আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি এই রহস্যের কোনো সন্ধান অবগত আছেন। চিঠি চুরির পর তাঁর সেই লুকোচুরি ব্যবহারই আমার এই সন্দেহের কারণ।

এইসময় আশুবাবুর নাম ছাপা একখানি চিঠির কাগজ আমার চোখে পড়ে। তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, সেই কাগজ, আর যে-কাগজে কবিতা লিখে রায়বাহাদুরের চিঠি বলে আমার কাছে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, এই দুই কাগজ একই জাতীয় কাগজ। তফাৎ এই যে, কবিতা লেখা কাগজখানার ছাপানো অংশটা বাদ দেওয়া হয়েছে। এ-থেকে পরিষ্কার বুঝলুম, ঐ চিঠিখানা তৈরি হয়েছে আশুতোষবাবুরই কারখানায়।

আপনারা জানেন, কিছুদিন পরে শেখর বোসের বাড়ীতে একটুকরো পাতলা রবার পাওয়া যায়। তখন এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে, অরুণ ব্যানার্জ্জি তার ডান-হাতের উল্কি ঢেকে রাখবার জন্যে ঐ রবারটুকু ব্যবহার করত। কাজেই রবার পড়ে যাওয়ায় হাতের উল্কি নিশ্চয়ই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ধূর্ত্ত অরুণ ব্যানার্জ্জি ওরকে এই জহর, একটা আঘাতের ভাণ করে তার উল্কি ঢেকে রাখতে সুরু করলে একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে।

জহরের হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখে আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর লাইসেন্স-নম্বর টুক্‌তে গিয়ে সে যে-ধরণের কাগজ ব্যবহার করলে, সেই কাগজ আর সাঁড়াশি-মার্কা লেবেলের কাগজ—একই কাগজ বলে আমার সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার ফলেই আজ এখানে হানা দেওয়ার সঙ্কল্প করি। তার ফল যা হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।”

একটু হেসে শশাঙ্কবাবু বললেন, “কিন্তু তোমার এই বন্দুটির সাঁড়াশির কোনো খোঁজ-খবর হল না ত ?”

বারীন বলল, “সে খোঁজ-খবর নেওয়া নির্ভর করছে এখন আপনার ওপর। জহরের বাক্স, বিছানা অনুসন্ধান করলে সাঁড়াশির আবিষ্কার হবে নিশ্চয়ই। আর আমি এ-কথাও বলতে পারি শশাঙ্কবাবু, যে, ঐ সাঁড়াশি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তার দাড়ার ভেতর এমন কোনো বন্দোবস্ত রয়েছে, যা দিয়ে যে-কোনো লোকের গলা ফুটো করে দেওয়া যায়, আর তার ভেতর দিয়ে কোনো মারাত্মক বিষ দেহের রক্তের সাথে মিশে যেতে পারে। শেখর বোসের বাড়ীতে আমি খুব কাছে দাঁড়িয়ে সাঁড়াশির এই রহস্য বুঝে নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম শশাঙ্কবাবু !

তা যাক, এখন তবে বিদায় ! বাকি কাজটুকু সমাধা করবার দায়িত্ব এখন আপনার,—আমার নয়।”

এই কথা বলে রিভলভারটি পকেটে পূরে বারীন যথার্থই ক্লান্ত ও অবসন্নভাবে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

শেষ